২৪.৫.২০ | **DEC 4.2** বাংলাদেশ : উদ্ভব, রাজনৈতিক, সামাজিক ইতিহাস ও সাহিত্যের পটভূমি।
সাম্প্রদায়িক (বাংলা)

- ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগ - স্বাধীনতা - সঙ্গেই নিহিত ছিল স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র (বাংলাদেশ) তৈরির স্বপ্ন।
- ধর্মকে ভেত্তি করে দেশ বিভক্ত হয়েছিল, সেখানে ভেত্তি করে নতুন আরেক দেশ গড়ে উঠল — বাংলাদেশ, ধর্ম তৈরি করে সম্প্রদায়, সেখানে ভেত্তি করে তৈরি হলো জাতিসত্তা, বাঙালি সেই জাতিসত্তা গড়ে তুললো নতুন দেশ — বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা।
- বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রেক্ষাপট।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা।
- স্বাধীনতা আন্দোলনে গণ আন্দোলনের ভূমিকা।

বিকাশ কান্তি মজুমদার

Scanned with CamScanner

বাঙালি ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদনা

অরুণ সেন

আবুল হাসনাত

নয়া উদ্যোগ

কলকাতা

Scanned with CamScanner

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ

সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান খুবই নবাগত। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও শিক্ষিতশ্রেণীর সংস্কৃতির ভাষা ছিল ফারসি, নয়তো উর্দু। আলাওল, দৌলত উজির বা বৈষ্ণব পদ-রচয়িতা মধ্যযুগের মুসলমান কবি ও সাধকদের অনুসৃত কোনো সাহিত্যিক ঐতিহ্য বা tradition শ্রেণীনির্বিশেষে ব্যাপকভাবে বাংলার মুসলিম সমাজে বিস্তারলাভ করেনি এবং এ সন্দেহও হয় যে, উত্তরকালে তাঁদের রচিত সাহিত্যের রসগ্রহণ নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য চাষি মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া এ-কথাও ভুল নয় যে, মধ্যযুগের মুসলমান রচিত কাব্যোপন্যাসে যে মননশীলতার পরিচয় পাই তার সঙ্গে 'বিশুদ্ধ' ইসলামি ভাবের আত্মীয়তা কম, অনূদিত মূল আখ্যানবস্তু বাদ দিলে (আখ্যান ভাগও মূলত ইসলামি নয়, ইরানের কিংবদন্তি ও লোকগাথারই একটি মুসলমানি ঢং মাত্র; আর পদ্মাবতী তো ভক্তিরসাশ্রিত একটি হিন্দু রূপক) তার রস, প্রকাশভঙ্গি ও ভাবসম্পদ সমস্তই বাঙালি—হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ভাবসমৃদ্ধ মধ্যযুগের বাংলা কাব্য থেকে তা অভিন্ন। সুতরাং এ-কথা বলা চলে যে, বাংলা সাহিত্যে 'ঐসলামিকতা'র (অর্থাৎ মুসলমানি ভাব নিয়ে মুসলমানের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির) ইতিহাস খুবই সাম্প্রতিক। ধর্মীয় বাঁধন কাটাতে হিন্দুর সাহিত্যকে যে বিভিন্ন অবস্থা ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে, মুসলমানের ভাষাকে তা করতে হয়নি। সে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অনেকগুলো স্তর ডিঙিয়ে একেবারে পার্থিব ও সংসারী সাহিত্য নিয়ে আবির্ভূত হল। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব যুগের লোকধর্মের প্রাণবান প্রকাশ হিন্দুর সাহিত্যের প্রতিপদে যে শক্তি দান করে এসেছে, সে শক্তি থেকে আজকের মুসলমান-সাহিত্য বঞ্চিত; কারণ, মুসলমানের ধর্মাচরণের, এমনকী লোকধর্মের ভাষাও কোনোকালেই বাংলা ছিল না। ইসলামি সংস্কৃতির ভাষার সাথে বাঙালি মুসলমানের সাক্ষাৎ যোগ না থাকায় এখানে ইসলামি ভাবধারায় পুষ্ট সজীব লোকসাহিত্য গড়ে ওঠবার সুযোগও পায়নি। উত্তর ভারতে ফারসির উত্তরাধিকারী উর্দুভাষী সমাজে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর

মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ও সাহিত্যগত যোগ বিদ্যমান তা বাংলায় রক্ষিত হয়নি। এখানে অভিজাতশ্রেণী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রেরণা পেয়েছে ফারসি ও উর্দুর ভিতর দিয়ে সিরাজ-ইস্পাহান-দিল্লি-লখনৌ থেকে, আর নিম্নশ্রেণীর মানসলোক আবর্তিত হয়েছে বাংলারই গ্রাম ও তার মুসলমান-অমুসলমান প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে। অভিজাতরা যেমন অ-বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আশ্রয় নিয়েছে, নিম্নশ্রেণী তেমনই সান্ত্বনা খুঁজেছে তার অ-মুসলমান প্রতিবেশীর লোকধর্মের কাব্যে ও সংগীতে। এই ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দূর করার জন্যেই হয়তো আরবি-ফারসি জর্জরিত, রস-বিবর্জিত মুসলমানি পুঁথি-সাহিত্যের জন্ম। কিন্তু বহির্ভারতীয় উপাদান নিয়ে বাঙালি জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আরবি-ফারসি ভাব বাংলার কাঠামোর ভিতর এনে অখণ্ড বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতি গঠনের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। (এই পুঁথির সঙ্গে 'ছয়ফুল মুলুক বদিউজামাল' বা 'লায়লি-মজনু'র একটা ঐতিহাসিক যোগ আবিষ্কার করা হয়তো দুষ্কর নয়—কিন্তু তাতে এই কথারই সমর্থন মেলে যে মধ্যযুগেও এই সাহিত্য অভিজাত মুসলমান-সমাজে কখনোই সমাদর লাভ করেনি—এর পাঠক আজকের মতো তখনও ছিল গ্রামের কৃষক মুসলমান)। উভয় শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যসাধন তো দূরের কথা, ধর্মনির্বিশেষে গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে যে একটা সংস্কৃতিগত ঐক্য গড়ে উঠছিল তা পর্যন্ত হল ব্যাহত। কাজেই একথা মানতে হয় যে, আধুনিক বাঙালি মুসলমান-সাহিত্যের পিছনে শুধু ঐতিহ্যের অভাব আছে তাই নয়, সংস্কৃতিরও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নেই এবং সেই জন্যই এর আবির্ভাব একটু আকস্মিক। এই আকস্মিকতার মূলে যে অর্থনৈতিক ও বৈপ্লবিক শক্তি ক্রিয়াশীল এবং যে ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে এর জন্ম তার আলোচনা এখানে করা দরকার।

রাজনৈতিক আধিপত্যের যুগে বাংলার মুসলমান শাসকশ্রেণী সর্বতোভাবে বাঙালি হতে পেরেছিল কিনা এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি যে একান্তভাবে নাগরিক ছিল, এ-কথা ইতিহাস-পাঠকমাত্রই স্বীকার করবে। এবং বাঙালি সংস্কৃতি যে একান্তভাবে গ্রামাশ্রিত একথা মেনে নিতেও গবেষণার আশ্রয় নিতে হয় না। শাসকশ্রেণীর এই নাগরিক কৃষ্টি—যার ইসলামি চেহারা সুস্পষ্ট এবং যা ফারসি ও উর্দুকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল—ইতিহাসের আনুকূল্যে বাঙালির মজ্জাগত হতে পারত কিনা সে আলোচনা বৃথা। কারণ, মুসলমানের প্রভুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গেই সে সংস্কৃতির পরিণতিতে বাধা পড়ল। মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙনের সময় থেকেই বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ক্ষীণ হয়ে পলাশীতে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এই সংস্কৃতির ধারাও রুদ্ধ হয়ে গেল। শাসকের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বও যে হস্তান্তরিত হল তার উল্লেখ বাহুল্য। বাংলার মুসলমান নগরগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে মুসলমান অভিজাতরা যখন নগর ছেড়ে গ্রামে ও ইংরাজের ব্যবসায়কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল, তখন থেকেই বাংলায় মুসলমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা।

Scanned with CamScanner

১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী উঠিয়ে আনার ফল সাত শতকে সারাসানীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর আরবি নগর কুফা ও বস্‌রা স্থাপনের মতোই মুসলমান সংস্কৃতির পক্ষে সুদূরস্পর্শী হয়েছিল।

সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত উপর্যুপরি আঘাতের ফলে বাংলার মুসলমান যে অধঃপতনের স্তরে গিয়ে পৌঁছোল তার থেকে দুটো ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হল। গ্রামে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় মুসলমান-সমাজের নেতাদের গ্রাম্য জীবনধারার সঙ্গে বাংলার নিজস্ব সম্পদ—তার কাব্য ও সংগীত, প্রেমভক্তিমূলক ধর্ম ও লোকসাহিত্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নিসর্গবৈচিত্র্যে অতীন্দ্রিয় রহস্যসন্ধানী মন—সাক্ষাৎভাবে সর্বপ্রথম পরিচিত হবার সুযোগ হল। তার থেকে একদিকে যেমন নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য মুসলমানের সঙ্গে অভিজাতদের একাত্মবোধ জন্মাল, অন্যদিকে তেমনি বাঙালি পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মুসলমান সংস্কৃতির ফারসি চেহারা লুপ্ত হতে আরম্ভ করল। রাজশক্তি কর্তৃক ফারসি অপাংক্তেয় হয়ে যাওয়ায় শেষোক্ত পরিবর্তন আরো দ্রুততর হল। ফারসির চর্চা একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও বাংলার সাংস্কৃতিক উপাদানকে আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা এই সময়কার ফারসি সাহিত্যে সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। বিদ্যাসুন্দরের মতো বাংলার প্রচলিত লোককাহিনীর একাধিক ফারসি অনুবাদই তার প্রমাণ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি মুসলমান-সংস্কৃতির বাঙালি হওয়ার এই প্রচেষ্টার পরিণতি হল এই যে বর্তমান শতকের গোড়ায় উত্তর ভারতের মুসলমানি উর্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। উর্দুভাষাভাষী মুসলমানের প্রতি বাঙালি মুসলমানের প্রচ্ছন্ন বৈরীভাব যাঁরা লক্ষ করেছেন তাঁরাই জানেন বাংলা ও উত্তর ভারতের মুসলমান-সংস্কৃতির ব্যবধান আজকে কত বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। হালি বা ইকবালের কাব্যের প্রতি অনুরাগ যে খুবই সম্প্রতি জন্মেছে এবং তার মূলে যে রাজনৈতিক প্রেরণা আছে তা হয়তো না বললেও চলে।

এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সাহায্য করল আর একটা সামাজিক বিপ্লব। উনিশ শতকের শেষের দিকে তার আরম্ভ এবং তার প্রাথমিক অবস্থা এখনও কাটেনি। সে হচ্ছে মুসলমান মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবীর অভ্যুত্থান। আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান কেমন করে দ্রুতগতিতে শ্রেণীচ্যুত হয়ে গেল সে কাহিনীর উল্লেখ হয়তো নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে প্রায় একশো বছর ধরে বাংলার হিন্দু যে অর্থনৈতিক ধারার ভিতর দিয়ে এসেছে, বাঙালি মুসলমানের জীবনে সে অবস্থা এসেছে মাত্র সেদিন—উনিশ শতকের শেষের দিকে। এই সময়গত পার্থক্য ছাড়াও হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্মের ইতিহাসের আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, যা এই দুই সম্প্রদায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক পরিণতিকে স্বতন্ত্র করেছে। মুসলমান আমলে হিন্দুরা যে সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্রশাসনে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে নির্দিষ্ট স্থান তাদের ছিল, ইংরাজ

আগমনের ফলে তা কিয়ৎপরিমাণে আলোড়িত হলেও মূলত তা ধ্বংস হয় নাই। ব্যবসায় বা শাসনক্ষেত্রে তারা শাসকশ্রেণীর একান্ত প্রয়োজনীয় সহকারীরূপে চিরকালই একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে। এক যুদ্ধকার্য ছাড়া ধনোৎপাদন ও ব্যবসায়ী হিশাবে পণ্য বিতরণ, সরকারি চাকুরি ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক জীবিকাই তাদের মুসলমান আমল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং এর ফলে তাদের আর্থিক স্থায়িত্ব রয়েছে অক্ষত। মুসলমানের বেলায় কিন্তু তা হয়নি।

যেহেতু যুদ্ধ ও শাসনকার্য ছাড়া অন্য জীবিকা তাদের ছিল না, সেজন্য নতুন শাসকশ্রেণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা গেল ধ্বংস হয়ে। অবশ্য কৃষকশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে পূর্ববঙ্গের মুসলমান-কৃষক গ্রাম্য অমুসলমানেরই সমপর্যায়ভুক্ত। হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী গঠন যত সহজ হয়েছিল (কারণ মধ্যবিত্তশ্রেণী তাদের মধ্যে চিরকালই একটা না একটা ছিল), মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী তত সহজে ও তত দ্রুত তৈরি হতে পারেনি। কথাটা অত্যুক্তির মতো শোনালেও খুবই সত্য যে, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে উন্নতিশীল মধ্যবিত্তশ্রেণী গঠিত হবার একটা মজ্জাগত ক্ষমতা আছে, মুসলমানের নেই এবং নেই বলেই এদের মধ্যবিত্তশ্রেণী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও এখনও সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠতে পারেনি।...

শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা যে কারণে ভারতের মুসলমান গত শতাব্দীর শেষের দিকে পেয়েছিল এবং পাচ্ছে তা ভেঙে না বললেও চলে। যে সমাজবিবর্তন স্বাভাবিক গতিতে হতে পারত তার সপক্ষে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ক্রিয়াশীল হওয়াতে যেমন একদিকে এই নবগঠিত সমাজের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রূপ গোড়া থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল, তেমনি এর সাংস্কৃতিক ঝোঁকও গেল বদলে। ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার গুণে রাজনীতির সঙ্গে এর সাংস্কৃতিক আদর্শও যে স্বাতন্ত্র্যপন্থী হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীও অবশ্য রাজশক্তির সমর্থন পেয়েছে, কিন্তু যে আর্থিক ও ঐতিহাসিক স্থায়িত্বের কথা উপরে বলেছি তার সাহায্যে বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে তাদের যোগ অব্যাহত ছিল—ফারসির স্থান ইংরাজি দখল করলেও সেই যোগ ছিন্ন হয়ে যায়নি। কিন্তু মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা ধ্বংস হয়ে গেছে; ইংরাজিয়ানার ভেতর দিয়ে সামাজিক আত্মোপলব্ধি হওয়াতে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশমান ধারা থেকেও সে চিরতরে সরে এসেছে; এমনকী বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে যে সংযোগ আরম্ভ হয়েছিল, উপরোক্ত রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে তাও থেমে গেল। মহাভারত, ধর্মমঙ্গল, পাঁচালি ও কবির গান ইত্যাদি বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের এই বিভিন্ন সাহিত্যরূপের কোনোটার সঙ্গেই যেমন অধুনা হিন্দুর অপরিচয় নেই, মুসলমানের ঠিক তেমন নয়। আজকের শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান যেমন একদিকে Mutannabi, Nizami, Amir Khusrau,

Scanned with CamScanner

Mir বা Ghalib-এর আরবি-ফারসি, উর্দু কাব্যের সাথে মানসিক আত্মীয়তা অনুভব করতে অক্ষম, তেমনি অন্যদিকে ময়নামতীর গান বা সোনাভানের পুঁথিও তার প্রাণে আর সাড়া জাগাতে পারে না।

বাঙালি মুসলমানের এই সাহিত্যিক রেনেসাঁস যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভ্যুত্থানেরই নামান্তর এবং এর গোড়ায় যে রাজনীতি অনেকখানি ক্রিয়াশীল একথা মনে রাখলে আধুনিক মুসলমানের উপন্যাস ও গল্পের মূল সামাজিক ইঙ্গিত বোঝা সহজ হয়। মুসলমানের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'আনোয়ারা' থেকে আরম্ভ করে আবুল ফজলের 'চৌচির' পর্যন্ত প্রায় সবেরই সামাজিক পটভূমিকা হল গ্রামের দরিদ্র কৃষকশ্রেণী এবং যে সমাজের চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে এবং যার দিকে নায়ক এবং গ্রন্থকার উভয়েরই একটা সুস্পষ্ট টান বিদ্যমান, সে হচ্ছে এই ইংরাজি-শিক্ষিত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণী। গল্পের পাত্র-পাত্রী এই সমাজের মধ্যেই বিচরণ করলেও তাদের মানসিক শিকড় রয়েছে আরও নীচে। অথচ এই সমাজের ভাব ও জীবন-আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কৃষক-জীবনের সত্যিকার বাস্তব উপন্যাস —মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মতো বই—যেমন মুসলমান লেখেনি, তেমনি অভিজাত সমাজের প্রাচীন নবাব বা জমিদারশ্রেণী নিয়ে উপন্যাসও তারা লেখেনি। ঐতিহাসিক উপন্যাস আছে, কিন্তু 'ঈশা খাঁ রায়নন্দিনী' অথবা 'আলমগীরে'র সামাজিক তাৎপর্য হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রঙমহলে'র মতোই সামান্য। একথা নাটক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এ নিয়মের ব্যতিক্রম যে হয়নি তাও নয়, অধুনা জাতিধর্মশ্রেণী নির্বিশেষে যে মনুষ্যগোষ্ঠী শহরের ইট, কাঠ, লোহার গারদে বাস করতে বাধ্য, তাদের নিয়ে যে দুই-একটা গল্প বা উপন্যাস লেখা হচ্ছে তার ঐতিহাসিক বা শৈল্পিক মূল্য হয়তো আছে, কিন্তু তা সামাজিক উপন্যাস হিশাবে অ-মুসলমান লিখিত গল্প-উপন্যাসের সঙ্গেই আলোচ্য, মুসলমানত্বের সুযোগ সেখানে অল্প, যেমন অল্প হিন্দুত্বের ছাপের। পূর্বেই বলেছি, মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী এখনও তার প্রাথমিক অবস্থায়; একটা স্থিতিশীল মধ্যবিত্তশ্রেণী এখনও সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠেনি। এইজন্য মনস্তত্ত্বমূলক বুর্জোয়া উপন্যাসের যে নিষ্ফলা পরিণতি—মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলা—সেই পরিণত খাঁটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বা গল্প এখনও মুসলমান-সাহিত্যে লেখা হয়নি। এই শ্রেণী এখনও গড়ন্ত অবস্থায় এবং সেই জন্যই বিপ্লবধর্মী। কিন্তু তা হলেও এই বিপ্লবের বিস্তার খুবই সংকীর্ণ; নিম্নতম শ্রেণীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গণ্ডি ভেঙে প্রত্যেককে এক-একটি ব্যবসাদার কিংবা সরকারি চাকুরিতে পরিণত করাতেই এর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। এই সব উপন্যাসের গল্পে যে সমাজের চিত্র আঁকা হয়েছে তার সঙ্গে একই শহর বা গ্রামের একই শ্রেণীভুক্ত অমুসলমানের সম্বন্ধ নেহায়েতই দূরসম্পর্কীয় কুটুম্বের মতো, বাহিরের ঘরেই সীমাবদ্ধ। এই সব

গল্পের হিন্দু কৃষক বা 'ভদ্রলোকে'র সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করা হয়, নয়তো নাটকীয় দুঃশাসন হিশাবে একটা বিজাতীয় ভয় অথবা ঘৃণামিশ্রিত শত্রুতা দেখানো হয়। উভয় ক্ষেত্রেই হিন্দুকে দূরে দূরেই রাখা হয়। একান্ত শহুরে নবলব্ধ ইংরাজিয়ানা-পীড়িত গল্পোপন্যাসেই অমুসলমানকে সমাজে স্থান দেবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তাও চেষ্টা মাত্র। এক শ্রেণীর, এক দেশীয় ও একই ভাষা-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক বঙ্গীয় মুসলমানের সমাজচিত্রে হিন্দুর সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তার অভাব দৃষ্ট হয় কেন, তার কারণ নির্দেশ করা সোজা। বাস্তব ও সাংস্কৃতিক জীবনে যোগ না থাকলে সাহিত্যে যে অমুসলমানের প্রতি একটা অনাত্মীয় ভাব থাকবে তা আর বিচিত্র কী? (অবশ্য হিন্দু লিখিত সাহিত্য সম্বন্ধে একথা আরো বেশি করে বলা চলে, কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর)। এই ব্যবধান রাজনীতি-আনীত বহির্বঙ্গীয় ইসলামীয়তার গুণে আরো বিস্তৃততর হওয়া সম্ভব এবং হয়তো পশ্চিমবঙ্গেও তা ছড়াতে পারে।

কাব্যের প্রকৃতি ভিন্ন বলেই হয়তো কাব্যে এই শ্রেণী-মনোবৃত্তির অবচেতন প্রকাশ ঠিক এমনভাবে হয়নি। ইসমাঈল সিরাজী বা মোজাম্মেল হকের মূল প্রেরণা রাজনীতি ছিল—স্যার সৈয়দ আহমদ অনুসৃত সে রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জাগরণ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষণ। সেইজন্য এদের কাব্য মূলত lyric রূপে epic; মুসলমানের কাব্য-ইতিহাসে তার স্থান নির্দিষ্ট, কিন্তু lyricism-এর যে বন্যা রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে আনলেন তার সঙ্গে এর যোগ নেই। মাইকেল-নবীন সেন-হেমচন্দ্রের ঐতিহ্যে লেখা 'মহাশ্মশান কাব্যে'র জোড়া আর রচিত হয়নি—তার কারণ বোধ হয় এই যে রবীন্দ্রযুগের গীতিকাব্যের বন্যায় মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা অসম্ভব ছিল। তাই গদ্যে যে স্বতন্ত্র পরিণতির দর্শন মেলে কাব্যে তা নেই। রবীন্দ্রযুগের বাংলা কাব্যে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবীয়তার বিকাশ, গোলাম মোস্তফা বা শাহাদাৎ হোসেনের কাব্য তা থেকে আলাদা নয়। নজরুল ইসলাম বাংলার কাব্যজগতে যে বিপ্লব এনেছেন, তার প্রভাব যেমন মুসলমান-সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তেমনই পূর্ববঙ্গের চাষি জীবনের যে lyric সুর জসীমউদ্দীন কাব্যে এনেছেন সে সম্পদও মুসলমান-কাব্যের একার নয়। অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান-কাব্যের কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই, যেমন আছে তাদের গদ্যের। এক কথায়, মুসলমানের কথাসাহিত্য আছে পিছিয়ে, কিন্তু কাব্যবিষয়, ছন্দ, শৈল্পিক ও সামাজিক চেতনা প্রায় সব দিক দিয়েই হিন্দু ও মুসলমানেরা সমকালীন ও পারস্পরিক দানে সমৃদ্ধ।

মুসলমানের এই সব গল্প, কাব্য, উপন্যাসে লেখক ও পাত্র-পাত্রীদের নাম ও ধর্ম ব্যতীত যে বস্তুকে ইসলামীয়তা নামে অভিহিত করি, তার অস্তিত্ব আছে কিনা এবং থাকলে কতটুকু, সে প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আর একটা প্রশ্নের উত্তরের উপর। সাহিত্যে ইসলামীয়তা বলতে কী বুঝি, হিন্দুত্ব বলতেই বা কী বুঝি? 'ইসলামী সংস্কৃতি'ও খুব স্পষ্ট অর্থব্যঞ্জক নয়, কারণ এর ঐতিহাসিক রূপের জন্য প্রধানত স্থান-

Scanned with CamScanner

কাল-পাত্রই তো দায়ী। ইসলামি চিত্রশিল্প বস্তুত মোঙ্গলীয় ও চৈনিক প্রভাবান্বিত ইরানি শিল্পেরই নাম; স্থাপত্যও সারাসেনিক অথবা ইরানি; দর্শনও অনুরূপ জাতিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। 'মুসলমানি' উপকথার প্রায় সবগুলিই যে ইরানের ও আরবের জাতীয় কাহিনী, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকে আর তর্ক নেই। সংস্কৃতি যে গোড়ায় জাতি ও দেশগত হতে বাধ্য এ কথা অনস্বীকার্য। অবশ্য যে মূলতত্ত্ব ইসলামের নিজস্ব এবং যা এই সংস্কৃতিকে স্থান, কাল ও পাত্রের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও একটা সুস্পষ্ট ঐক্য দান করেছে, তার সংজ্ঞা নির্দেশ সহজ। একেশ্বরবাদ, সাম্য ও আন্তর্জাতিকতা, আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ, আশাবাদী সাংসারিকতার মধ্যে আত্মোপলব্ধি, এ সব তত্ত্ব মোটেই জটিল নয় এবং এর সাহিত্যে রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ বা বিরোধও নেই। কিন্তু এ কথা কি নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই ধর্মীয় মূল তত্ত্ব দেশের জাতীয়, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক প্রভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে সাহিত্যে রূপায়িত হতে পারে? ফেরদৌসী বা জামী-র লেখাকে কি সম্পূর্ণ ইসলামি বলা যায়, না তাকে ফারসি ঐতিহ্যের পর্যায় বলা বেশি সমীচীন হবে? তাছাড়া এই মূল তত্ত্ব যে ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে মিশে যায়নি, সে কথাও তো নির্ভুল নয়। বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি বলতে কি আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মানুপ্রাণিত উপাদানেরই সমষ্টি বুঝি না? রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে দর্শন তাকে ইসলামের বৈরাগ্যবিমুখ কর্মযোগী, আত্মনির্ভরশীলতার প্রকাশ কি নেই? এই মাপকাঠি অনুসারে কিন্তু মুসলমানের আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে ইসলামি বা মুসলিম বলতে আপত্তি থাকা উচিত, কারণ জলধর সেনের 'করিম সেখ' বা শৈলবালার 'শেখ আন্দু'র মতোই এই সব গল্পোপন্যাসে যে সমাজের আলেখ্য আছে, তার মুসলমানত্ব নেহাতই আকস্মিক, সে সমাজ হিন্দু হলে গল্পের কোনো সাংঘাতিক ব্যাঘাত ঘটত না। বাজারে ও গ্রামাফোনে প্রচলিত ইসলামি গানকেও ইসলামি বলতে এইজন্য আমার আপত্তি। স্থান ও পাত্র ছাড়া এ সব গানের হৃদয়বৃত্তি ও অনুভব রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিরহ বিষয়ক গান থেকে কোনো অংশে ভিন্ন নয়। হজরত মুহম্মদের ব্যক্তিত্ব, তাঁর আত্মীয় ও জন্মভূমিকে নিয়ে অহেতুকী ব্যক্তিগত হাসি-কান্নায় উদ্বেল হওয়া, খোদা ও তাঁর রসুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও বাধ্যতার স্থলে নারীসুলভ প্রেমে আত্মহারা হওয়া, এ দৃষ্টান্ত একান্তভাবে ভারতীয় বৈষ্ণব ও ভক্তদের (এবং সুফিদেরও), সনাতন ইসলামের বিরোধী না হোক, অনুকূল এ নিশ্চয়ই নয়। এই গানের লোকপ্রিয়তাও হয়তো এই জন্যই, বাঙালি মনে যে চিরন্তন বিরহী বাস করে, তারই বেদনা বাংলার নিজস্ব সুরে প্রকাশ করার জন্য—এর ইসলামি চেহারার জন্য নয়।

ইসলামের ইতিহাস থেকে সাহিত্যের উপাদান ও রস সংগ্রহ করা নিয়ে তর্ক চলতে পারে না, যেমন তর্ক চলতে পারে না মুসলমান-সমাজে ও গৃহে ব্যবহৃত একান্ত প্রয়োজনীয় আরবি ফারসি শব্দের বাংলায় প্রয়োগ নিয়ে; এবং আমার বিশ্বাস

কোনো সাহিত্যরসিকই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন না। কারণ, সাহিত্যের ভিত্তি বাস্তব সমাজে এবং বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি বাংলাভাষা-ভাষী বাঙালি সংস্কৃতি সম্পন্ন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজ। সে বাঙালি সমাজে মুসলমান নানা কারণে এতদিন তার যোগ্য স্থান নিতে পারেনি বা নেয়নি, কিন্তু যখনই তা নিতে পারবে, যখনই মুসলমান আধুনিক বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে তখনই তার সমষ্টিগত প্রকাশ সাহিত্যে হতে বাধ্য, এবং তাতে সাহিত্যের কল্যাণই হবে।

Scanned with CamScanner

রণেশ দাশগুপ্ত

পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামে ছাত্রসমাজ

জনগণের যে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী, তাদের চিন্তাচেতনার গতিধারা সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা বৈপ্লবিক শ্রেণীদৃষ্টিতে যাচাই করে দুইভাবে পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত, বিগত চব্বিশ বছরে পর্যায়ে-পর্যায়ে যে লোক-অভ্যুদয় হয়েছে, তার ঘটনাবলির মধ্যেকার চেতনার উত্তরণগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর চিন্তার নব নব উপাদানকে বার করে আনা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, গত চব্বিশ বছরে রাজনৈতিক নিবন্ধরচনা এবং যেসব সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে, তার হিশাব-নিকাশ করলেও মুক্তিসংগ্রামের চেতনার উপাদানগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে।

এখানে লোক-অভ্যুদয়ের ব্যাপারটিকে প্রাথমিকভাবে যাচাই করে নিতে গেলে দেখা যাবে, কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী গণ-আন্দোলন শ্রেণীসত্তার দিক দিয়ে পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। জনগণের একটি বিশেষ অংশ ছাত্রসমাজ বরাবরই এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিশেবে রয়েছে। ছাত্রসমাজ উনিশ শো বাহান্নর বাংলাভাষার সংগ্রামের স্রষ্টা ছিল। তারাই উনিশ শো উনসত্তরের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি সমন্বিত এগারো দফা আন্দোলনের স্রষ্টা হয়েছে। গণ-আন্দোলনের উদ্যোগগ্রহণকারী ছাত্রসমাজের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে সংগ্রামী জনতার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে গত চব্বিশ বছরে। স্বাধীন পূর্ববাংলার ঘোষণাটিও এসেছে ছাত্র-সমাজের মধ্য থেকে।

শ্রমিকশ্রেণী বসে থাকেনি। ১৯৬৪ সালে আয়ুব-বিরোধী সংগ্রামে পূর্ববাংলার সাধারণ ধর্মঘট প্রমাণ করেছিল যে, মূলত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই যাওয়া উচিত। কিন্তু এ-ঘটনা পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেনি। এই কারণেই সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে শ্রমিকশ্রেণী বরং লালন করারই দায়িত্ব নিয়েছে। পূর্ববাংলার গণমুক্তি সংগ্রামের ছাত্রসত্তাকে জনৈক বুদ্ধিজীবী পূর্ববাংলার একটি

ছাত্রসম্মেলনে কাব্যিকভাবে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য : নদীমাতৃক পূর্ববাংলার একটি নতুন ধরণের নদী হচ্ছে ছাত্র আন্দোলন। এই নদী পূর্ববাংলার মুক্তি আন্দোলনের প্রাণ।

হৃদয়গ্রাহী হলেও এটা নৈসর্গিক ব্যাখ্যা—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয়। এতে ছাত্রসমাজের চরিত্রের পরিবর্তমান রূপটি অথবা ছাত্রসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত পূর্ববাংলার ব্যাপকতম জনগণের সক্রিয় ও সচেতন ভূমিকা বেরিয়ে আসে না। তবু, এই ধরণের ব্যাখ্যা যে সামনে আসে, তার কারণটিও ইতিহাসের দিক দিয়ে সত্য। ছাত্রসমাজের পতাকাতেই পর্যায়ে-পর্যায়ে শহিদের বুকের রক্ত ঢেলে আঁকা হয়েছে পূর্ববাংলার মুক্তি-সংগ্রামের লক্ষ্যমাত্রাগুলি।

এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে সামনে রেখে কিছুটা গভীরে যাবার চেষ্টা করলে দুটি বিষয় আমাদের চোখে পড়বে। প্রথমত, ছাত্রসমাজের চেতনার বৃত্তটি ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে এসেছে, অর্থাৎ ছাত্রসমাজের চিন্তাধারাতে নতুন নতুন লক্ষ্যমাত্রা লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে পূর্ববাংলার জনগণও মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শকে প্রসারিত করে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু গভীরে যাবার চেষ্টা থেকেই স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসতে বাধ্য। এই যে চিন্তাধারার বৃত্তের সম্প্রসারণ, এই যে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম থেকে পূর্ববাংলার স্বাধীনতাযুদ্ধে উত্তরণ, এতে কি ছাত্রসমাজ এবং জনগণের সম্পর্কের মধ্যে ভিতরে-ভিতরে কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি? নিপীড়িত শ্রমিক-শ্রেণী এবং কৃষকদের সঙ্গে কি ছাত্রসমাজের চেতনাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি? এই প্রশ্নের কিনারা করতে গিয়ে প্রথমত যদি ছাত্রসমাজের দিকে তাকানো যায়, তবে খোলা চোখেও একটি ছবি নজরে পড়বে। সেটি এই যে, ছাত্রসমাজের কাঠামোটা গত চব্বিশ বছরে বদলে গিয়েছে ভিতরে-ভিতরে। এবং এই পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের চেতনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। দ্বন্দ্বাত্মক বস্তু-গতিবাদের দর্শনের আলোকে বিষয়টি আলোচনাযোগ্য। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্র পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশকে দমন করে রাখার জন্যে যেসব ব্যবস্থা করে এসেছে, তার মধ্যে শিক্ষা-সংকোচন-নীতি অন্যতম। আয়ুব খানের আমলের প্রথম দিকে দশ বছরের মধ্যে একটা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা 'মহাপরিকল্পনা'কে বাস্তবায়িত করার জন্যে যে বাদশাহি 'হুকুম' জারি হয়েছিল, তা দু-তিন বছর পরেই পরিত্যক্ত হয়। কায়েমি স্বার্থবাদী শাসক ও শোষকরা অচিরেই বুঝতে পারে যে, যে কোটি কোটি ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করতে পারে, তারা শুধু মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে নয়, উচ্চশিক্ষার জন্যেও আগ্রহী হয়ে উঠবে। প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিকল্পনা লাটে ওঠে। কিন্তু শিক্ষার প্রসারের জন্যে পূর্ববাংলায় জনসাধারণের তাগিদকে লাটে ওঠানো যায়নি। পূর্ববাংলার গণমুক্তিসংগ্রামের বৈষয়িক

Scanned with CamScanner

লক্ষ্যমাত্রাগুলি অঙ্কিত হয়নি বলেই অবৈষয়িক বা আত্মিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে জোর পড়েছে বেশি।

পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামের এটি বৈশিষ্ট্য। লোক-অভ্যুদয়ের তরঙ্গরাশি যখন প্রশমিত হয়েছে, তখনও শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে যখন ব্যর্থতা এসেছে, তখন প্রস্তুতি চলেছে নতুন অভ্যুত্থানের। এই প্রস্তুতি যতটা বাস্তব উপকরণজাত (অবজেকটিভ), তার চেয়ে বেশি মানসিক উপকরণজাত (সাবজেকটিভ)। যা সাধ্য, তার চেয়ে সাধনা বেশি। যা করণীয় তার চেয়ে ভাবনা বেশি। শিক্ষার ক্ষেত্রে জনগণের নিজস্ব উদ্যোগ-আয়োজনের আপেক্ষিক ব্যাপকতা এই কারণেই সম্ভব হয়েছে। পূর্ববাংলার জনগণ খালি হাত-পায়ে বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা করতে পারেনি। পারেনি ভারী শিল্প স্থাপন করতে। অথচ নতুন বিজ্ঞানের জগতের দিকে এগিয়ে চলার তাগিদ নষ্ট তো হয়েইনি, বরং প্রত্যেকটা বড় বড় লোক-অভ্যুদয় এই তাগিদকে উশকে দিয়েছে। একারণেই শাসকচক্রের শিক্ষা-সংকোচনের নীতিকে অগ্রাহ্য করে নিদারুণ লাঞ্ছনা আর উপেক্ষা এবং অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও পূর্ববাংলার শিক্ষাবিস্তার ঘটেছে। গ্রামে-গ্রামেও স্থাপিত হয়েছে মহাবিদ্যালয় বা কলেজ।

এই শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজের ভিতরে শ্রেণীসত্তার পরিবর্তন ঘটেছে।

পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজে নাগরিক উচ্চ বা নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রাধান্য ছিল ইতিপূর্বে, তা অক্ষুণ্ণ থাকলেও কৃষকসমাজ থেকে সোজাসুজি আসা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্র-আন্দোলনে কতকগুলি নতুন চিন্তার উপকরণ যোগ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য এই যে, পূর্ববাংলার অধিকাংশ ছাত্রসম্মেলনে ছাত্র-সমস্যার প্রতিকারের দাবির অনুপাতে বিশ বছর আগেও জাতীয় সমস্যাবলির সমাধানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে অনেক বেশি। ছাত্রসমাজই যেখানে ভাষা থেকে শুরু করে খাদ্য এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবিতে আয়োজিত গণ-বিক্ষোভের জাতীয় হোতা, সেখানে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিপূর্বে বিভিন্ন নির্যাতিত শ্রেণী ও স্তরের বক্তব্য বিচারে ছাত্রসমাজ যে-পরিমাণ সহানুভূতির পরিচয় দিত, তার তুলনায় বাস্তবায়নের তাগিদে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত কম। ছাত্রসমাজের নতুন চরিত্র গড়ে ওঠায়, অর্থাৎ ছাত্রসমাজে বিশেষ করে দরিদ্র কৃষকের সংখ্যানুপাতিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, নির্যাতিত শ্রেণী ও স্তরের বক্তব্যগুলি একটা বিশেষ ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা লাভ করেছে।

কথাটা এইখানেই শেষ নয়। ছাত্রসমাজের অভ্যন্তরেই নয়, ছাত্রসমাজ এবং জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মধ্যেকার সংযোগের ক্ষেত্রেও ছাত্রসমাজের নতুন চরিত্রের প্রতিফলন প্রণিধানযোগ্য।

গত দুই দশকে এ-ব্যাপারে দুটি ঘটনা ঘটেছে। ১৯৫২ সালে বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজে একটি আদর্শবাদী সাধনার প্রবর্তন করে। কিন্তু ছাত্র-আন্দোলনে যারা আত্মনিয়োগ করে, তাদের পক্ষে ছাত্রসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক

বজায় রাখা পাঁচ-ছ বছরের বেশি সম্ভব হয় না। অত্যন্ত কর্মঠ ও বৈপ্লবিক চেতনা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেও ছাত্রোত্তরজীবনে আসে অসংলগ্নতার সমস্যা।

এ-সমস্যা অত্যন্ত প্রকট ছিল প্রথম দিকে, যখন ছাত্রজীবন শেষ করে কৃষক বা শ্রমিক আন্দোলনে অবিলম্বে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি ছাত্রসমাজে।

সে-সময়ে ছাত্র-আন্দোলনের অনেক সেবা কর্মী পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেছিল। জন-বিচ্ছিন্ন এই সার্ভিসের কৃত্রিমতার খোলশের মধ্যে অনেক তাজা এবং বিপ্লবী মন অবরুদ্ধ হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে এবার যখন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই সার্ভিসের জিঞ্জির ভেঙে গেল, তখন দেখা গেল, অনেক অবরুদ্ধ মন মুক্তি পেয়েছে এবং অতীতের সংগ্রামী সূত্র তুলে ধরেই যেন জেলায়-জেলায় মহকুমায়-মহকুমায় মুক্ত এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বিনা দ্বিধায়। এই মুক্তি-বিহঙ্গেরা যে-দিগন্ত স্থাপন করেছে তাদের চোখের সামনে সেটা বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একটা স্বাভাবিক আত্মিকতা স্থাপনেরই প্রয়াস।

তবে এতে পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামে ছাত্রসত্তার প্রমাণ পাওয়া যায় নতুনভাবে। ছাত্রসমাজের আদর্শবাদ আজও প্রাক্তন ছাত্রদের মনে কাজ করে চলেছে।

দুই দশকের দ্বিতীয় ঘটনা : ছাত্র-আন্দোলনের কর্মীরা ছাত্রজীবন শেষ হওয়া মাত্র শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠক হিশেবে কাজ করার রেওয়াজ গড়ে তুলেছে একটা।

প্রগতিবাদী প্রত্যেকটি ছাত্রদলের মধ্যে একটা শ্রমিকমুখী ও কৃষকমুখী প্রবণতা কম-বেশি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, ছাত্রসমাজের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক সংযোগ স্থাপনের একটা সূত্র স্থাপিত হয়েছে। গত দুই দশকের প্রথম দশকে যত ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-আন্দোলনে বিপ্লবী সংগঠক হিশেবে কাজে নেমেছিল, তার তুলনায় এবারকার দশকের ছাত্রসমাজের মধ্য থেকে বিপ্লবী সংগঠক বেরিয়ে এসেছে তুলনামূলকভাবে বেশি। এর একটা কারণ নিশ্চয় এই যে, শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের ভূমিকা স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় এবং প্রভাবশালী। শুধু ছাত্রদের একটি অংশেই নয়, কিছু সংখ্যক ছাত্রীও যে লাল নিশান নিয়ে কিংবা লাল টুপি পরে কৃষক সমাবেশে যোগ দিয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিকতা অনেকখানি অতিক্রান্ত হয়েছে নিশ্চয়। কৃষক-বিক্ষোভে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাল নিশানধারী কিংবা লাল টুপি পরিহিত ছাত্র-ছাত্রীরা কৃষকদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি, এ-অভিযোগ এসেছে নিন্দুক এবং শুভার্থী উভয়ের কাছ থেকেই। এতে হয়তো কৃষক-আন্দোলনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামের বিশেষ সত্যটি। ছাত্রসমাজই এখনও চূড়ান্ত পদক্ষেপের প্রধান উদ্যোক্তা থেকে গিয়েছে।

অবশ্য ছাত্রসমাজের কাঠামোর যে চরিত্র বদল হয়েছে গত এক দশকে এবং ছাত্র

Scanned with CamScanner

ও ছাত্রীদের উভয়েরই মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে বৈপ্লবিক সম্পর্ক স্থাপন করার যে ধারা প্রবর্তিত হয়েছে, তাতে জনগণের ছাত্রসভা একটা গণমুখী রূপ নিয়েছে, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই পটভূমিটিকে চোখের সামনে রাখলে পূর্ববাংলার বর্তমান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী মর্মভূমিকে অনুধাবন করা সহজ হবে।

যে-ছাত্রসমাজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নির্দিষ্ট করেছে, তারাই যে সমাজতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে উদ্যোক্তা হবে, এ-বিশ্বাসকে উপরোক্ত বিশ্লেষণ একটা সংগতি দিতে সক্ষম।

গত চব্বিশ বছরে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ এবং তারই পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক এবং অন্যান্য মেহনতি মানুষের চিত্তভূমি যে-বৈপ্লবিক সমৃদ্ধি লাভ করেছে, সেটা একটা পরম্পরার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে এগিয়ে এসেছে।

বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিতে একে দেখার অর্থ, একে ভেঙে ভেঙে টুকরো করে দেখা নয়। যে-বাঙালি জাতীয়তাবাদী বাতাবরণের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের মুক্তির অনিবার্যতা রয়েছে, তাকে ভেঙে ফেলে দেবার ব্যাপার নয়। বাংলার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মেহনতি মানুষের মুক্তিকে অনিবার্য করে তোলাই একে বৈপ্লবিক শ্রেণী-দৃষ্টিতে দেখা।

ছাত্রসমাজের বিকাশের ধারাটিকে পুরোপুরি বুঝতে পারলে পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লবী চিত্তভূমিকে অনুধাবন করা যাবে অনায়াসেই। পূর্ববাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকরা ইতিমধ্যে যে যে বৈপ্লবিক চিত্তভূমি গড়ে তুলেছে, তাকে সরাসরি বিশ্লেষণ করারও একটা পথ আছে এবং সেটা হচ্ছে প্রথাসিদ্ধ পথ। তবে ছাত্রসমাজের যখন চরিত্র বদলে গিয়েছে, তখন এদিক থেকে বিশ্লেষণে এগিয়ে যেয়ে শেষ পর্যন্ত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হব।

স্বাধীন শোষণমুক্ত বাংলা—ছাত্রসমাজ এবং মেহনতি মানুষের উভয়েরই চিন্তাচেতনার ফসল।

Scanned with CamScanner

সন্‌জীদা খাতুন

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জীবনের বাঁকে বাঁকে এমনভাবে পেয়েছে যে তাঁকে কেবল বিশেষ কোনো ব্যক্তি হিশেবে বিবেচনা করা এ দেশের মানুষের পক্ষে আজ কঠিন। তিনি সমগ্র উপমহাদেশের হলেও, বাংলাদেশের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাঁকে আমরা আমাদের পথের সাথী এবং বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক হিশেবেই জেনেছি। বাঙালি মুসলমানের জীবনে যা-কিছু ঘটে গেছে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎবাণী এবং সংকটকালে পদে পদে তাঁর সহায়তার আশ্চর্য যোগ বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে গভীর তাৎপর্যবহ। সে জন্যেই তিনি আজ ব্যক্তিমাত্র হিশেবে বিবেচ্য নন। তাঁর এই রূপান্তরণ দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে ক্রমে ঘটে উঠেছে। সেই পথটি পর্যালোচনা করলে অবিভক্ত বঙ্গদেশের কাল থেকে বাঙালি পরিচয় নিয়ে মুসলমানের যে বিভ্রান্তি-দুর্ভাবনা-সংশয়, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক সম্পর্কটি আমাদের জ্ঞানগোচর হবে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের কথা ছেড়ে, এখানে আমি বাঙালি মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক দ্বিধা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ, এবং পরিশীলিত বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করব। অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক জমিদারিতে যে মুসলমান প্রজাসাধারণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেখান থেকেই উপস্থিত বিষয়টির বিশ্লেষণ শুরু হতে পারে। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি থেকেই পল্লীবাসী সাধারণ মুসলমানের পরিচয় পেয়েছিলেন, তাদের সরল প্রীতির প্রসাদ অনুভব করে ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার প্রভেদ অনেক। শিক্ষিত নাগরিক মুসলমানের ভিতরে তিনি জটিলতা লক্ষ করেছিলেন। পাশাপাশি দেখেছিলেন, তাঁর দেশহিতৈষী রাজনীতি-চেতন হিন্দু কর্মচারী কীভাবে প্রতিনিয়ত অন্ধ ঘৃণাপূর্ণ অন্তরে হিন্দুর জন্যে পাতা জাজিমের প্রান্ত গুটিয়ে মুসলমান প্রজাদের জন্যে ধুলোর আসন নির্দেশ করছেন। মানুষের

দেবতার এই অপমানের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর 'কালান্তরে'। আবার, নাগরিক রাজনীতিকদের 'দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে (মুসলমানকে) বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গি...কখনোই সফল হইতে পারে না।' (পৃ. ২৬২, 'রবীন্দ্ররচনাবলী' চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী)—এ সাবধান-বাণীও রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন 'কালান্তরে'। 'কালান্তর' সংকলনের প্রবন্ধগুলো ইংরেজি ১৯১৪ থেকে শুরু করে ১৯৩৭ সালের ভিতরে লেখা। অন্তত তেইশ বছর পরিধির ভাবনা ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক চিন্তার এইসব নিদর্শনের সঙ্গে পাঠকসমাজ মোটামুটিভাবে পরিচিত। তাই, সে প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করে এখন আমি সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আর আলাপ-আলোচনার কথা বলব। দেখতে পাচ্ছি, 'কালান্তরে'র লেখাগুলির সঙ্গে আমার আলোচ্য প্রসঙ্গের কালগত যোগ আছে। এসব প্রসঙ্গও অন্তত ১৯২৭ সাল থেকেই চলছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাগুলো যে বিশেষ কালসীমায় বাঁধা নয়, তার তাৎপর্য যে সুদূরপ্রসারী এবং সর্বকালীন, সেইটিই আমার বলবার বিষয়।

১৯২৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখের এক সাময়িকীতে প্রকাশিত 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ' লেখাতে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কোনো কবিতায় 'খুন' শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কথা জেনে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কবিতার লাইনটি ছিল— 'উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।' 'বাঙ্গলার কথা' নামের কোনো পত্রিকায় নাকি রবীন্দ্রনাথের ওই আপত্তির কথা ছাপা হয়েছিল। নজরুল বলছেন—'কবি তো নিজেও টুপি পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর আক্রোশের..' ইত্যাদি ইত্যাদি এবং 'এই আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।' ('নজরুল-রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬২৬)। প্রসঙ্গটি সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন ভাষাতে যোগ্য শব্দ ব্যবহার নিয়ে। উল্লিখিত কবিতায় 'খুন' শব্দের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কাছে বিহিত মনে হয়নি। তাঁর বক্তব্য ছিল—'হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি...।' ('বাংলা শব্দতত্ত্ব', পৃ. ৩০৫-৬)। রবীন্দ্রনাথের এই মত নিয়ে তর্ক চলতে পারে, যেমন আবুল ফজল লিখেছেন, 'রাজশেখরবাবুর চলন্তিকায় "খুনচড়া" শব্দটিও দেখলাম এবং তিনি তার অর্থ দিয়েছেন, "ক্রোধে রক্ত গরম হওয়া"। ...রক্ত অর্থে খুন শব্দটি আমাদের ভাষার অভিধানে স্থান পেয়েছে।' ('রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', পৃ. ২৮)। বাংলাভাষাতে আরবি-ফারসি শব্দ চলবে কিনা কিংবা কতদূর চলবে—এই নিয়ে একটা আন্দোলন হচ্ছিল তখন।

রবীন্দ্র-নজরুল বিরোধটিকে ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলা' নাম দিয়ে হাস্যপরিহাসের ভিতর দিয়ে নিষ্পত্তি করবার চেষ্টায় বলেছিলেন—'বাংলা

Scanned with CamScanner

কবিতায় যে "খুন" চলবে না, এমন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ, কাজী শাহেব এ পৃথিবীতে আসবার বহু পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ "বাল্মীকি-প্রতিভা" নামক যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তার পাতা উলটে গেলে "খুনে"র সাক্ষাৎ পাবে।' ১২৮৭ সালে লেখা বাল্মীকি-প্রতিভায় 'পাখিটি মরিলে কাঁদিয়া খুন' বলায় দস্যুরাজা বাল্মীকির প্রতি দস্যুদের তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছিল বইকী। যাহোক, প্রয়োগ প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে, বাংলাভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের বিতর্কটি বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

১৯৩২ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'ডক্টর পণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' প্রণীত 'মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা ২য় ভাগ', তৃতীয় ভাগ এবং অন্য এক লেখকের লেখা এক গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন। প্রবন্ধের নাম ছিল 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলাভাষা'। এই লেখাতে আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শব্দার্থের যে বিবরণ ছিল তার কয়েকটি উল্লেখ করি। প্রদীপ = চেরাগ, ধার্মিক = দীনদার, স্বপ্ন = খাব, বিদ্যা = এলেম, কৃপণ = বখীল, ধনী = মালদার, কৃতজ্ঞতা = শোকরগুযারী, মাহাত্ম্য = বোযর্গী, সৃষ্টি = পয়দা, নিষ্পাপ = বেগুনাহ, পাপপুণ্য = নেকিবদি, আশ্রয় = পানাহ, মৃদু = আহেস্তা ইত্যাদি।

'প্রবাসী'র ভাদ্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ওই প্রবন্ধের উল্লেখ করে বলেন—সহজভাবে বাংলাভাষায় আগত আরবি-ফারসি যেমন—হাজার, মেজাজ, বেচারা, নেশাখোর, বদমায়েশ শব্দ বদল করবার কথা উঠতেই পারে না। কিন্তু 'শিশুপাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে আরবিআনা পারসিআনা করাটাকেই আচারনিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা বলে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজি স্কুলপাঠ্যের ভাষাকেও মাঝে মাঝে পারসি বা আরবি ছিটিয়ে শোধন না করেন কেন?' কীট্‌সের গ্রিকপুরাণ আশ্রিত তথা অমুসলমান আবহের 'হাইপিরিয়ন' কবিতাকে ফারসির মিশেল দিয়ে 'শোধন' করলে কেমন দাঁড়ায়, কৌতুকভরে তারও একটি নমুনা দাখিল করেছেন।...

ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মৌলবীছাহাব বলতে পারেন আমরা ঘরে যে বাংলা বলি সেটা ফারসি-আরবি জড়ানো, সেইটাকেই মুসলমান ছেলেদের বাংলা বলে আমরা চালাব। আধুনিক ইংরেজি ভাষায় যাঁদের এংলোইন্ডিয়ান বলে, তাঁরা ঘরে যে ইংরেজি বলেন, সকলেই জানেন সেটা আন্‌ডিফাইল্‌ড আদর্শ ইংরেজি নয়—স্বসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতবশত তাঁরা যদি বলেন যে, তাঁদের ছেলেদের জন্যে সেই এংলোইন্ডিয়ানি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা না করলে তাঁদের অসম্মান হবে, তবে সে কথাটা বিনা হাস্যে গম্ভীরভাবে নেওয়া চলবে না।' ('প্রবাসী', পৃ. ৬০২)।

১৩৪১-এর বৈশাখ অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ আলতাফ চৌধুরী নামের কোনো সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিকে দুঃখ জানিয়েছেন—'উত্তর-পশ্চিমে, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব নেই। সে-সকল প্রদেশে অনেক হিন্দু উর্দু

ব্যবহার করে থাকেন, তাঁরা আড়াআড়ি করে উর্দুভাষায় সংস্কৃত শব্দ অসংগতভাবে মিশল করতে থাকবেন, তাঁদের কাছ থেকে এমনতর প্রমত্ততা প্রত্যাশা করতে পারি নে। এরকম অদ্ভুত আচরণ কেবলই কি ঘটতে পারবে বিশ্বজগতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশে? আমাদের রক্তে এই মোহ মিশ্রিত হতে পারল কোথা থেকে? হতভাগ্য এই দেশ, যেখানে ভ্রাতৃবিদ্রোহ দেশবিদ্রোহে পরিণত হয়ে সর্বসাধারণের সম্পদকে নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজের সুবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে দুর্দিনে সে কথাও মানুষ যখন ভোলে তখন সাংঘাতিক দুর্গতি থেকে কে বাঁচাবে?' ('বাংলা ভাষাতত্ত্ব', পৃ. ৩০৭)।

ভাষা আর সাহিত্য 'সর্বসাধারণের সম্পদ'। তা নিয়ে সম্প্রদায়-ভাবনা থেকে দেশদ্রোহ, 'আত্মাবমাননা' এবং পরিণামে 'সাংঘাতিক দুর্গতি'—একথা রবীন্দ্রনাথ অত আগেই বলেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ এবং চরিত্রের পরিচয় নেই বলে মুসলমানদের মনে দুঃখ আছে। ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক আবুল ফজল শাহেবকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন— 'শক্তিমান মুসলমান লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেননি, এ অভাব সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশলাভ করে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলাভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে...।' ('বাংলা শব্দতত্ত্ব', পৃ. ৩০৭-৮)। দুঃখের বিষয় এই যে, মুসলিম সাহিত্যিকরা আপন পরিবেশের ছবি তুলে ধরবার দায় এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য হিন্দু সাহিত্যিকরা কেন মুসলমান সমাজ নিয়ে লিখলেন না—তাই নিয়ে তর্ক করতে থাকতেন!

ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমদর্শিতার অভাব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই দেখা দিচ্ছিল। এই নিয়ে বেদনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধে বলেছিলেন—'দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে দেশেরই অগৌরব বলে মনে করে থাকি।' (রচনাকাল ১৩৪০/১৯৩৩)।

রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বের অনুসরণে ভাষা-সাহিত্যক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টার নাশকতাশক্তি নিয়ে আলতাফ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশ ১৩৩৯/১৯৩২ সালের 'রূপরেখা' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থে অমুদ্রিত সেই চিঠির কিছু উদ্ধৃত করছি। 'কিছুকাল ধরে হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রনৈতিক বৈষম্যের অনুরূপ একটি স্বাতন্ত্র্যবাদকে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী করবার দুশ্চেষ্টা চলেছে। আধুনিককালে সাহিত্যকে আশ্রয় করে মানবমনের যে উৎকর্ষ সাধন হয়েছে ভেদনীতির দ্বারা তার বিনাশ ঘটবে এই আমার আশঙ্কা।'

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও পত্র থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে বিভাগপূর্ব কাল থেকেই বাঙালি মুসলমানের ভাষা-সাহিত্যক্ষেত্রে 'ভেদনীতি'র আগমনের কথা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

পাকিস্তান হবার পরে রাষ্ট্রভাষার বিতর্কের প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা লক্ষ করব ভাষাক্ষেত্রের দ্বিধার ব্যাপারটি, অবিভক্ত বাংলাতেই যার মূল প্রোথিত হয়ে গেছে। এই 'দ্বিধা'টি যে বিশেষ পরিকল্পনাজাত, তার দিকেও দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে। বাঙালি মুসলমানের ভাষা বাংলা না উর্দু এই প্রশ্ন এবং এর বিচারে ফরিদপুরনিবাসী শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান নবাব আবদুল লতিফের ভূমিকার কথা স্মরণ করছি। ব্রিটিশ আমলে হান্টার কমিশনের কাছে উক্ত নবাব যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তার বিবরণ আবু জাফর শামসুদ্দীনের বই থেকে বিবৃত করছি। উক্ত নবাবের ভাষা এই—'নিম্নশ্রেণীর লোক (মুসলমান) নৃতাত্ত্বিক বিচারে হিন্দুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং তাদের প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় হওয়া উচিত। কিন্তু তার পূর্বে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর সংস্কৃতবহুল বাংলাকে খাঁটি বাংলায় পরিবর্তিত করতে হবে এবং মুসলমানের দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে সমস্ত আরবি-ফারসিজাত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলো তার মধ্যে যোগ করতে হবে। এ জন্য আইন-আদালতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাকে আদর্শরূপে গণ্য করা যেতে পারে। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানের মাতৃভাষারূপে উর্দুকে অনুমোদন করে নেয়া উচিত। শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে তারা উর্দু ভাষা ব্যবহার করে।' ('আত্মস্মৃতি', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭)।

'শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে তারা উর্দুভাষা ব্যবহার করে'! ফরিদপুরের কোনো গণ্ডগ্রাম থেকে আসা ওই নবাব শাহেব সেকালের কিছু নব্যশিক্ষিত মুসলমানের ধারায় 'আশরাফ' অর্থাৎ অভিজাত বনে যাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উর্দু জবানকে মাতৃভাষা বলে দাবি করতে উৎসুক হয়েছিলেন। এইভাবে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজে এঁরা যে আশরাফ-আতরাফ বর্ণভেদ সৃষ্টি করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ কাজী ইমাদাদুল হক তাঁর 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বাঙালি মুসলমানের ভাষা বিষয়ে নবাব শাহেবের মতো লোকেদের তত্ত্ব সমাজের এবং সংস্কৃতির দ্বিধার মূলে কাজ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ওই দ্বিধা থেকেই দ্বি-জাতিতত্ত্ব, এবং তারপরে পাকিস্তান আদায় হলে, মুসলমানের জন্য নতুন বাংলা রচনার মহা উৎসাহ দেখেছি আমরা। রবীন্দ্রনাথ সৌভাগ্যবান, তাঁকে মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়ে নতুন মুসলমানি বাংলায় রচিত সাহিত্য আস্বাদন করতে হয়নি। নামেই নতুন-বাংলার-স্বয়ম্প্রকাশ-নিদর্শন সরকারি 'মাহে-নও' মাসিকপত্রে মুদ্রিত গল্পে, নায়কের সম্মুখে নায়িকার ঘর্মাক্তকলেবর অবস্থার বিবরণের একটিমাত্র পংক্তিতে মুসলমানি বাংলার আদর্শ ছবিটি আপনারা পেয়ে যাবেন। —'লেবাসের অন্দরে তার তামাম তনু পোসিনায় তরবতর'।

নবোদ্দীপনার গানেও মুসলমানি বাংলার উদ্দীপনা তখন। 'কলিজার খুনে ওয়াতানের ধূলি করিয়া লাল/আজাদীর তরে শহীদ হলে যে বীর দুলাল, / তাহারা মোদের সালাম নাও, তাহারা মোদের আশিস্ দাও / ভাঙা কেল্লার উর্ধ্বে যাহারা উড়ালে ঝান্ডা আল-হেলাল।' কিংবা, 'ভাঙিল জিন্দান টুটিল জিঞ্জির, / স্বাগে চল্ আগে চল্ আজাদ বাহাদুর। / জিন্দা গাজী ওরে, ভুলিয়া ডরভর / ঝান্ডা হেলালী দুহাতে তুলে ধর। / আজাদী অভিযানে, কওমী জয়গানে / আসুক সাহারার প্লাবন বারিধির' ইত্যাদি।

সাহিত্যের আত্যন্তিক 'যাবনিমিশাল' ভাষাকে নিই-না-নিই উদ্দীপনার ও-সমস্ত গানে সোৎসাহে কণ্ঠ মিলিয়েছি আমরাও। সুরের ছন্দের টান ছিল, প্রাণে ছিল নতুন পাওয়া স্বাধীনতার আবেগ, সে তো সত্য। তারপরে রাষ্ট্রভাষা এবং রাষ্ট্রীয় নানা বিধিবিধানের আঘাতেই আমাদের টনক নড়ল। আর, গান দিয়েই যখন বাঙালি তার সাংস্কৃতিক স্বাধিকার রক্ষার জন্যে প্রতিরোধ গড়বার পথে এগুল, তখন এলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রদেশের 'পূর্ববাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্বপাকিস্তান' নামকরণেও ধাক্কা লেগেছিল। তখনকারই গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। দেশপ্রেমের ঘোষণা হিশেবে আরো গান এল রবীন্দ্রনাথের—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা' —এমন আরো কত! কংগ্রেসি আন্দোলনের শুরুতে ইংরেজিতে বক্তৃতা করবার হিড়িক-দেখে-লেখা রবীন্দ্রনাথের 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে / আকুল নয়ননীরে' গানের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা হিশেবে বাংলাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার বক্তব্যের বিস্ময়কর মিল আমাদের চমকে দিল। 'কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি। / কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায় / সে যে আমার জননী রে।'

রবীন্দ্রনাথ যেন ডালি সাজিয়ে বসেছিলেন, আমরা তৈরি জিনিশ হাতে পেয়ে আনন্দে কণ্ঠে তুলে নিলাম। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের সহযাত্রার শুরু। এই প্রবন্ধের আরম্ভে যত কথা লিখেছি, তার কিছুই জানি না তখনো। দিনে দিনে জানা হল, এখন মিলিয়ে নিয়ে বুঝতে পারি। অবাক লাগে বৈদেশিক সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা নিয়ে আপত্তি জানাতেও দরকার হয় ওই রবীন্দ্রনাথকে। 'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে? / তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে'।

একান্তরে দিনগুলি এল, গাইলাম 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে— / নগরে প্রান্তরে বনে বনে। অশ্রু ঝরে দু নয়নে, / পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে'। গাইলাম 'সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীন প্রাণে। / সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত, / শির নত কত অপমানে'। একের পর এক পরিস্থিতি বুঝে গান জুগিয়ে দিলেন তিনি আমাদের। ক্রমে জানলাম, পথের সাথী

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে কতদূর পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে গেছেন। তাঁর রেখে-যাওয়া বাণী আমাদের ডাক দিল প্রথমে সত্যিকার বাঙালি হবার, তারপরে, চিরন্তন মানবতার পথে অভিযাত্রার। সেই পথেরই সাধনা বাংলাদেশের সৎবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীর।

এ কথাও জানি, রবীন্দ্রবিরোধী বাঙালি মুসলমানের সংখ্যাও কম নয়, আর তারা অনেক বেশি প্রচারনিষ্ঠ, সংগঠিত এবং প্রভূত বিত্তশালী বলে শক্তিমান কর্মীবাহিনী গড়ে তুলে সাধারণ মানুষকে সতত বিভ্রান্ত করে চলেছে। দূর প্রাচ্য থেকে অর্থ এবং অস্ত্রের সরবরাহ চলছে অবিরল। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন বাঙালি তাদের দুরভিসন্ধি বিষয়ে অবহিত। তাই সচেতন বাঙালিদের পথ ভিন্ন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়ে বাঙালির সারসত্তার সাধনায় এবং প্রচারে নিবেদিত এঁরা। এ পথেই বাঙালি জাতিসত্তার বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে আমরা চলতে চাই মানুষ হবার পথে। কঠিন। পরীক্ষার ভিতর দিয়ে এই যাত্রা, সে পরীক্ষা সততা এবং সদুদ্দেশ্য প্রেরিত।

Scanned with CamScanner

সংযোজন

বাঙালি ও বাংলাদেশ

'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশ' শব্দদুটি নিয়ে ১৯৭১-এর আগে পর্যন্ত কোনো অসুবিধা ছিল না। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরও, আজ যাকে বাংলাদেশ বলি, তাকে বলা হত প্রথমে পূর্ববঙ্গ এবং পরে পূর্বপাকিস্তান। সেই সূত্রে ওখানকার বাঙালি পূর্ববাংলার বা পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি। কিন্তু ১৯৭১-এর পর পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালির কাছ থেকে 'বাংলাদেশ' শব্দটি যেন বেদখল হয়ে গেছে। রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অর্থে যে-দেশকে 'বাংলাদেশ' বলা হচ্ছে এখন, তার বাইরে ঐতিহাসিক আবেগের টানে পশ্চিমবঙ্গকে আর 'বাংলাদেশ' বলা যাবে না। 'পশ্চিমবঙ্গ' সূত্রে কোনো লেখকের কলমের ডগায় 'বাংলাদেশ' শব্দটি স্বতই চলে আসতে চাইলে তাঁকে সংযত হতে হয়, নিষেধ আরোপিত হয় কথকের উচ্চারণে। 'বাঙালি' নিশ্চয়ই উভয় দেশের মানুষকেই বলা হয়, প্রসঙ্গ ধরে তাদের দেশীয় পরিচয় একরকমের বুঝেও নেওয়া যায়—কিন্তু 'বাংলাদেশ'-এর আর উদ্ধার নেই। এখন অবশ্য, নানা ব্যাপারেই এক হওয়া সত্ত্বেও, দুই বাংলার বাঙালির ভিন্ন চারিত্র্য বা গড়ন আছে কিনা সে-কথাও উঠছে—তবে উভয় ক্ষেত্রেই 'বাঙালি' শব্দটি আমরা নিঃসংকোচে ব্যবহার করতে পারি।

'বাঙালি মুসলমান' এই শব্দযুগ্মতা নিয়ে ঝঞ্ঝাট কিন্তু অনেককালের। হিন্দুদের মুখে 'বাঙালি বনাম মুসলমান' এই বিন্যাস তো অনেককালের চেনা, শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উল্লেখ ছাড়াই। পরে জেনেছি, মুসলমানেরাও দীর্ঘকাল হিন্দু ও বাঙালি-র সমীকরণে অভ্যস্ত। বলা বাহুল্য, দুটোই এসেছে পরস্পরের প্রতি একই দূরত্ববোধ থেকে।

ইংরেজ-আগমনের পরের আধুনিক কাল থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদটা সম্পূর্ণ হল, বলা যায়। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং তারই ফলে সর্বস্তরে পিছিয়ে-পড়াটা একই সঙ্গে ঘটতে থাকল মুসলমানদের জীবনে। অবশ্য কারণটা আরো মৌলিক— জন্মসূত্রে যারা প্রধানত ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণ হিন্দু, দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষ,

তাদের পিছিয়ে-থাকাটা তো প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। সেই পিছিয়ে-থাকার মনস্তত্ত্ব বহুকাল ভেতরে-ভেতরে কাজ করে গেছে। পক্ষান্তরে, ঠিক এভাবেই সুবিধাভোগী হিন্দুদের মধ্যে কাজ করেছে উঁচুকপালেপনা— প্রতিবেশীর প্রতি তীব্র অবজ্ঞা।

মনের এই ব্যবধানই তো হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ, দাঙ্গা ও দেশভাগের কারণ। ইংরেজদের ইন্ধন জোগানো তো পরের ব্যাপার—কারণটা ছিল বলেই তাকে উশকে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মুসলমানদেরও ছিল প্রবল ঘৃণা হিন্দুদের প্রতি, তাই হিন্দুদের থেকে আলাদা হওয়ার তীব্র আকুতিতেই 'বাঙালি' পরিচয় গ্রহণ করার কথা মনেই ওঠেনি তাদের—যেহেতু বাঙালি-পরিচয়টা পদাধিকার বলে হিন্দুরা করায়ত্ত করেছে আগেই। হিন্দুদের প্রতিক্রিয়ার কারণও তা-ই—তারা 'বাঙালি' হলে মুসলমানেরা 'বাঙালি' হবে কী করে! এটা যে অনেকদিন পর্যন্ত এবং অনেক গভীরে চারিয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ আধুনিককালে এসেও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মুসলমানদের ভূমিকা আছে, অবদান আছে, তা দৃষ্টান্তসহ প্রমাণ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন মুসলমান লেখকেরাই। তা হিন্দুদের বোঝাতে যেমন, তেমনি নিজেদেরকেও বোঝাতে।

দেশভাগের আগেও মুসলমানদের অনেকেরই মনে বিপরীত ভাব ছিল না তা নয়। ইতিহাস থেকে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানসিকতা যেমন উনিশশতকের হিন্দু জাগরণে ছিল, তেমনি ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমানদের জাগরণেও। কিন্তু আপামর জনগণের মনের দূরত্বকে কাজে লাগাল শাসক ইংরেজ এবং উভয় ধর্মের পাণ্ডারা।

এর পরিণতিতে যে দেশভাগ, তা-ই বরং শিক্ষা দিল বাঙালি মুসলমানদের, ফিরিয়ে আনল সংবিদ। বোঝা গেল ধর্মের মিল-অমিল কিছুই না অন্য স্বার্থের কাছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণের অভিজ্ঞতায় তারা বুঝতে পারল, জমিদার হিন্দু বা শাসক ইংরেজের চেয়ে কম ভয়ংকর নয় এই 'কাছের' মুসলমানেরা।

১৯৪৮ এবং ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবির্ভাব হল নতুন বাঙালি মুসলমানের। এর আগে বাঙালি পরিচয়টা ছিল যেন দ্বিধান্বিত, সীমিত, অনিশ্চিত। এবার এই পরিচয়টাই হয়ে উঠল প্রধান—আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল তাকেই প্রতিষ্ঠা করা। শুধু আবেগ নয়, সংযত বুদ্ধিও ছিল এর পেছনে। তাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর সত্ত্বেও উর্দুকে হঠানো নয়, তাদের দাবি ছিল উর্দু ও বাংলাকে একই সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা করা। ভাষা-আন্দোলন তখন-তখনই সাফল্য লাভ করেনি—কিন্তু এই ব্যর্থতাই জ্বালিয়ে দিল আগুন। নতুন একটা বড় লড়াই যে শুরু হল, সেটাই আসল কথা। অবশ্যই সেই লড়াইও খুব সহজ হয়নি। যে ধর্মীয় জেহাদের মনটাকে এতদিন লালন করা হয়েছে, তাকে দূর করা কি সোজা? কিন্তু এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের নবীন চেতনা, তার ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকল। শুধু

Scanned with CamScanner

শহরে নয়, গ্রামেও। একান্ত গ্রামীণ আরজ আলী মাতুব্বরের মতো মানুষও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিতে পেরেছিলেন।

এই নবীন সংগ্রামী বাঙালি মুসলমানদের হাতিয়ার হল বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি (নাগরিক সংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতি উভয়ই) এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য, হয়তো তার চেয়েও বেশি তাঁর গান অনুপ্রাণিত করল এই ভাষা-ভিত্তিক স্বাধিকারের আন্দোলনে। রবীন্দ্রনাথের গান একবার এই শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়েছিল, সেই গানই ফিরে এল খণ্ডিত দেশের নতুন বেদনা ও লড়াইয়ের মুহূর্তে। রবীন্দ্রসংগীত আরো একবার হয়ে উঠল বাঙালি জাতির আত্ম-উদ্বোধনের উচ্চারণ।

এগুলোই যেমন এই নবজাগ্রত বাঙালির টিকে থাকার অস্ত্র, তেমনি পাকিস্তানি শাসকদের বা মৌলবাদীদের আঘাতও তাদেরই বিরুদ্ধে। তাই ফতোয়া শোনা গেল—বাংলা ভাষা বা বাংলা হরফ নয়, আরবি ভাষা, আরবি হরফ; বাঙালি সংস্কৃতি নয়, ইসলামি সংস্কৃতি; রবীন্দ্রনাথ নয়, নজরুল। অর্থাৎ নজরুলকেও ভুলভাবে, অভিসন্ধিমূলকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষে দাঁড় করানো হল। কিন্তু এই নতুন বাঙালি কোনো কিছুর পরোয়া না করে আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্র বাড়িয়েই চলল। বাঙালি সংস্কৃতির চিহ্ন বা অভিজ্ঞানগুলোকে অবলম্বন করেই নিজেকে ছড়িয়ে দিল। পয়লা বৈশাখে নববর্ষ, পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রজয়ন্তী, বসন্ত-উৎসব, বর্ষাবরণ, নবান্ন-উৎসব—এ সমস্ত কিছু উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েই তার প্রতিবাদ, বাঙালিত্বের পতাকা ওড়ানো। কেননা হিঁদুয়ানির কলঙ্ক লেপন করে মৌলবাদীরা তাকে বর্জনের ডাক দিয়েছে। বলা বাহুল্য, কোনোটার জয় একতরফা হয়নি, সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের এই লড়াই ক্রমশই পাকিয়ে উঠছিল।

রাজনীতির লড়াই, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার লড়াইও চলছিল পাশাপাশি। মাতৃভাষার জন্য দাবি ও সংস্কৃতির আত্মীকরণের এই অভিযান অনিবার্যভাবে বাঙালিকে পৌঁছে দিচ্ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের রাস্তায়। ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়, ১৯৫৮-তে আইয়ুব খানের উত্থান, ১৯৬৬-তে শেখ মুজিবের ছয়-দফা দাবি, ১৯৬৯-এ ছাত্রসমাজের আন্দোলন ও তা থেকে বৃহত্তর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লিগের জয় এবং ১৯৭১-এ পূর্ববঙ্গের মানুষের ওপর পশ্চিম-পাকিস্তানি সৈন্যের বর্বর আক্রমণ—এইসব ঘটনা ও দুর্ঘটনার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় মুখর সে-দেশের ইতিহাস। পশ্চিম-পাকিস্তানি শক্তির হিংস্রতার ধারাবাহিকতা এবং তার বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা। আর, এখানেই রাজনীতি ও সংস্কৃতির লড়াই এক হয়ে গেল ওপার বাংলায়। ছাত্রসমাজের গৌরবজনক ভূমিকার কথা বারবার বলা হয়েছে। এবং খুবই গুরুত্ব পেয়েছে সংস্কৃতিকর্মী ও লেখককর্মীদের সৃষ্টিশীলতা। দেশের মূল লড়াইয়ের সঙ্গে

সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের লড়াই এতটা তাৎপর্যময় সম্পর্কে অন্বিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বোধহয় খুব বেশি পাওয়া যায় না বিশ্বে আর কোথাও। দুই দশক জুড়ে ওপার বাংলায় আবেগ কল্পনা ও মননের চর্চার যে দায়কে কাঁধে তুলে নিয়েছিল বাঙালি, তার প্রায় প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও।

এভাবেই এগোতে-এগোতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যখন পৌঁছে গেল বাঙালি, তখন দেখা গেল তার শৌর্যেরও প্রকাশ। বাঙালির এই নতুন পরিচয়ে অনেকেরই বিস্ময়। আবদুল হকের লেখায় পড়ি : 'বহুকাল বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধ হয়নি, এবং বহুকাল আগে সংঘটিত যুদ্ধে প্রধানত বাঙালিরা অস্ত্র ধরেনি। সেই বাঙালি যুদ্ধ করেছে একাত্তর সালে। ব্যাপ্তি, তীব্রতা এবং সমগ্র জনসমাজের অংশগ্রহণের দিক দিয়ে বাঙালির ইতিহাসে এর তুলনা নেই। আর এ-যুদ্ধ বাঙালি করেছিল অধিকতর সশস্ত্র শিক্ষিত অভিজ্ঞ বাহিনীর বিরুদ্ধে, সবকিছু জেনে-শুনে। শিক্ষা অস্ত্র অভিজ্ঞতা সবই তার ছিল স্বল্প, কিন্তু সংগ্রামী ঐক্য, দৃঢ়তা এবং তীব্রতা বাঙালির সমগ্র ইতিহাসে অতুলনীয়, এবং বুঝি তার চেয়েও বড় কথা—অভাবনীয়। এই ছিল বাঙালির নবজন্ম; এ-জন্ম আমরা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি।'

তাই মোটেই অসংগত মনে হয় না, আজ যখন সমকালীন ও উত্তরসূরি একই সঙ্গে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, কিংবা তারই বীজ রোপিত হয়েছিল যে একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে তাকে নিয়ে কিংবা তার স্মৃতিবাহী শহিদ মিনারকে নিয়ে। আমরা অনায়াসেই ছুঁতে পারি বাঙালির সেই স্পর্শকাতর জায়গাগুলিকে। সেই বাধাবন্ধহারা আবেগ এমনকী প্রকাশ পেতে পারে মুজিবুর রহমানকে নিয়েও—কারণ একাত্তরের যুদ্ধে বাঙালির যা কিছু প্রাপ্তি তা তো তাঁকে ঘিরেই—তিনিই হয়ে ওঠেন বাঙালির এই নতুন আত্মপ্রতিষ্ঠার পৌরাণিক পুরুষ। আর একাত্তরের স্মৃতিকথাগুলি যেন তারই পুরাণকথন।

একসময় 'মুসলমান' পরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান মেনে নিয়েছিল দ্বিজাতিত্ব, চেয়েছিল পাকিস্তান—আর এখন 'বাঙালি' পরিচয় আবিষ্কার করেই ঘটাল এই মুক্তিযুদ্ধ, অর্জন করে নিল স্বাধীন 'বাংলাদেশ'। এ থেকেই বোঝা যায়, ১৯৭১-এর পর 'বাংলাদেশী' পরিচয়ে কেন তাদের এত অনীহা—এ যেন ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত গোটা ইতিহাসকেই অস্বীকার করা। তারা শুধু 'বাঙালি'—'বাংলাদেশের বাঙালি'।

এর পরের বৃত্তান্ত অবশ্য মর্মান্তিক। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বিস্ময়, কিন্তু আরো বিস্ময়, কীভাবে কত তাড়াতাড়ি, মুক্তিযুদ্ধের যা-কিছু স্বপ্ন তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, যা-কিছু অর্জন তা অপহৃত হল। তাই তো কারো মনে হয় 'অপহৃত বাংলাদেশ'। কারো মনে হয় এই বাংলাদেশ শুধুই 'পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়'। যে আবদুল হক একাত্তরের বাঙালির বিস্ময়কর শৌর্যের কথা বলেছিলেন, তিনিই এখন নতুন

Scanned with CamScanner

'বিস্ময়ে'র কথা শোনান : 'সংগ্রামের পরে-পরেই বিধ্বস্ত বাংলাদেশে লুব্ধ বাঙালির অর্থলালসা; আহত বাঙালির শরীর মাড়িয়ে, তার করুণ মিনতি উপেক্ষা করে তাকে লুণ্ঠন, বহুকাল যাবৎ লুণ্ঠিত বাঙালিকে পুনরায় লুণ্ঠন, যখন তার নিরাপদ হওয়ার কথা সেই সময়ে।' একেই তিনি বলেছেন বাঙালির 'আত্মহত্যার প্রবণতা'। নির্মলেন্দু গুণ শেখ মুজিবকে বলেন 'এক আত্মঘাতী জাতির নেতা'।

স্বপ্নভঙ্গের বেদনা কত লেখায় যে প্রকাশ পায় তার যেন শেষ নেই। বাংলাদেশে বাঙালি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন শুধু ব্যর্থতাই সেই স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষদের চোখে পড়ে। কেউ নাগরিক মধ্যবিত্তের অধঃপতন নিয়ে চিন্তিত, কেউ শিক্ষাঙ্গনের কুৎসিত পরিবেশে ক্রুদ্ধ, কেউ সংখ্যালঘুর নিঃশব্দ দেশত্যাগে বেদনার্ত, আবার কেউ ফতোয়াবাজদের হাতে অসহায় নারীর নির্যাতনে বাকরুদ্ধ। হাসান আজিজুল হকের মনে হয় : 'অন্ধকারে, ক্রমাগত ধস নামছে, ছোট হয়ে আসছে বাংলাদেশ, অন্ধকারে, বাতাসের ঝড়ের ঝাপটে জাহাজ ডুবে যাচ্ছে...।'

না কি কারোর মনে হতে পারে, এই আত্মসচেতনতা, এই আত্মগ্লানি এখনো যে টিকে আছে সেই বাস্তবই বলে দেয়—অন্ধকার নয়, আলোয় আলোয় মুক্তিই আসবে একদিন! এই ক্ষণে যখন মনে হচ্ছে, কোনোই আশা নেই, পরের ক্ষণেই কি শোনা যাচ্ছে না, ক্ষীণভাবে, হয়তো খুবই ক্ষীণভাবে, পরিত্রাণের সংকেত! রাজনীতি সমাজ সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই সেই ছোট-ছোট আলোর ইশারাই পাওয়া যায় বাঙালির একক ও যৌথ জীবনে—যদি আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সমগ্রের দিকে চোখ মেলে তাকাই। অন্তত অন্য বাংলার মানুষ হিশেবে তা টের পেতে অসুবিধা হয়নি আমাদের কারো-কারো। বিপদের, আশঙ্কার বা ব্যর্থতার দিকগুলো শনাক্ত করার মনটা এখনো যখন বেঁচে আছে, তখন তাকে নির্ভর করেই এগোনো যায়।

মাঝে-মাঝে কোনো কণ্ঠস্বরে হয়তো উগ্রতা ও অতিশয়োক্তি একটু বেশি প্রকাশ পায়, অস্মিতাবোধ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সহযাত্রীদের কাছে থেকে, হয়তো এমনকী বিপথগামীও করে—কিন্তু তবু ওই উচ্চারণেও সাহসের দিক, প্রাণাবেগের দিক যেটুকু আছে তাতেই ভরসা রাখা যায়। মনে হয়, এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের বাঙালির উঠে-আসার ছবিটি যে সত্য তা প্রমাণিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকেও তা প্রেরণা জোগাবে।

অরুণ সেন

Scanned with CamScanner

রশীদ করীম

অমর একুশে বক্তৃতা ১৯৮৯

আমি অনেকটা এলোমেলোভাবে বিভিন্নকালের কোনো কোনো ঘটনার উল্লেখ করে দেখতে চাইব, সেই সব অসংলগ্ন প্রেরণার যোগফল কোনো একটি সম্পৃক্ত উপসংহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা। একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলন আমাদের জাতীয় চেতনার যে উদ্বোধন ঘটাল তার শুরু যে '৫২ সালের এই ঘটনা দিয়েই নয়, বরং বহু আগেই যে তার সূত্রপাত, সে সম্পর্কে আজ সকলেই একমত। কিন্তু ঠিক কত আগে, সেই সময়টাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখা যাবে, খোলা দরজা দিয়ে বহু মত প্রবেশ করছে। বাঙালি মুসলমানদের, আরো বিশেষ করে বলতে হলে, বাংলাদেশের মুসলমানদের আত্মপরিচয়, অনেকের মনেই যে এখনো অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, তার আভাস পাই, যখন কেউ বলেন, আমরা বাঙালি তো বটেই, কিন্তু একই নিশ্বাসে বলতে হবে যে, আমরা মুসলমানও বটে। এই দুই 'বটে'-র মধ্যে আমাদের পরিচয়টা ভাগাভাগি হয়ে আছে। আমাদের এই দুই সত্তাকে আলাদা করে দেখার মধ্যে খুব সম্ভব সাংস্কৃতিক কোনো তাগিদ কাজ করছে। পাকিস্তান আমলেও আমরা দেখেছি, আমাদের বাঙালি পরিচয়কে খুবই সন্দেহের চোখে দেখা হত। তাই দুই-প্রান্তের পাঞ্জাবিরা নিজ নামেই স্থির থাকলেন, কিন্তু সেই আমলের পূর্ব-বাংলা নামটিও কর্তাব্যক্তিদের সহ্য হল না। দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া কোরিয়া আর জার্মানি নিজ নামেই কায়েম থাকল—নাগরিকরাও তাদের প্রিয় কোরিয়ান আর জার্মান নাম মুছে ফেলেনি, শুধু আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে দেশগুলি তাদের নামের আগে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দিক-নির্ণয় জুড়ে দিয়েছে; কিন্তু আমরা বাঙালি পরিচয় হারিয়ে পূর্বপাকিস্তানি হয়ে গেলাম। কিন্তু নাম হারালাম বলে কি আমরা আমাদের সংস্কৃতি আর আত্মপরিচয় হারিয়েছিলাম? অথবা এই আঘাতটা এল বলেই আমাদের মধ্যে এক নতুন জাতীয়তাবাদ উদ্বুদ্ধ হল? সেটাকেই আরো উশকে দেয়া হল? বাংলাদেশের মুসলমান সুদীর্ঘকাল থেকেই মুসলমান—এবং একই সঙ্গে বাঙালি। এই দুই পরিচয়ের মধ্যে

কোনো বিরোধ নেই, যদি না অবশ্য মুসলমানি সংস্কৃতি বলতে কোনো একটি বিশেষ কল্পিত সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তি আমাদের মনের মধ্যে খেলা করে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশগুলিও মুসলমান-প্রধান, কিন্তু তাঁরা নিজ-নিজ দেশের সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেননি। আমাদের পরিচয়ও খুব সংক্ষেপেই দেওয়া যায়। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, আমরা যা আছি, আমরা তাই। পূর্বপাকিস্তানি নাম বহন করেও আমাদের কণ্ঠ থেকেই গগনভেদী উচ্চারণ শোনা গিয়েছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। নানারকম প্রভাবের সংমিশ্রণে আমরা এক সমন্বিত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করেছি। এবং বর্তমান সংস্কৃতিও আরো বিভিন্ন ও বিচিত্র ধ্যান-ধারণার প্রভাবে ধীরে ধীরে ও অলক্ষ্যে বিবর্তিত হতেই থাকবে। কোনো দেশেই সংস্কৃতি এক বিশেষ জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। আধুনিক বিশ্বের নাগরিক, সংস্কৃতির ব্যাপারে, ছুঁচিবাই আঁকড়ে থাকতে পারবেন না। গালিব, ইকবাল, মীঁর প্রমুখ কবি উত্তরভারতে যেভাবে সমাদৃত চর্চিত ও গীত, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল ইসলাম সে রকম নন। এবং এই সমাদর ও প্রভাব ধর্ম-নির্বিশেষে—এবং প্রভাবের অভাবটাও তাই।

তবু সমস্ত চিত্রটা অত সহজ নয়। যাঁরা বলেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ইংরাজের সৃষ্টি, তাঁরা পুরো কথাটি বলেন না। ইংরাজদের আগমনের আগে থেকেই ইতিহাস এই বিরোধের সাক্ষ্য দেয়। এই বিরোধের পুরো কারণটাকেই ধর্মীয় বলা যাবে না। বিজেতা ও বিজিতদের সম্পর্কের মধ্যে বিষ প্রবেশ করবেই। নিজের এখতেয়ার কেউ ছেড়ে দিতে চাইবে না। হিন্দুরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আবার, বাংলার মুসলমান শেরশাহ দিল্লির মুসলমান মোগল বাদশাহ হুমায়ুনকে তাড়া করে দিল্লির মসনদ দখল করেছেন। বাংলাদেশের মুসলমানরা মুসলমান বলে '৭১ সালে বর্তমান পাকিস্তানের মুসলমানরা এতটুকু রহম করেননি। মুসলমান হয়েও লাখো লাখো মুসলমানের জান নিয়েছেন। তাই জনাব তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা) তাঁর 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় অনেক আগেই বলেছেন : 'আজ যাঁহারা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নকে সযত্নে পরিহার করিয়া শুধু ধর্মীয় বন্ধনকে সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চান তাঁহারা অখণ্ড ভারতের মুসলিম আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই কেবল বিকৃত করিতেছেন না, বরং প্রকৃত সমস্যা এড়াইবার এবং শোষণ ও বৈষম্য অব্যাহত রাখার দুরভিসন্ধি আঁটিতেছেন। ধর্মই যদি রাজনৈতিক জীবনে একমাত্র বন্ধন হয়, তাহা হইলে আরব জাহানে, যেখানে শুধু ধর্মই নয় ভাষাও অভিন্ন, সেখানে তেরোটি পৃথক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারিত না। আরব জাহানে শুধু তেরোটি পৃথক রাষ্ট্রই নয়, তেরোটি রাষ্ট্র পরস্পর-বিরোধীও বটে।'

আবার বলতে হয়, ব্যাপারটা অত সহজও নয়। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের রেখাটিকে ইংরাজরা একটা সুবর্ণরেখা হিশেবে দেখলেন এবং সেখানে নিজের হাতে অনেকটা রং চড়িয়ে দিলেন। এই বাংলাদেশেই দু-একটি আন্দোলন শুরু হল এক

Scanned with CamScanner

মেজাজে, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর না হতেই দেখা গেল, মেজাজটা বিগড়ে গেছে এবং আন্দোলন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিপথগামী হয়েছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-৬২) এবং রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) প্রসঙ্গ আমার স্পর্শ করে যাব। তাঁরা উভয়েই ধর্মের একেবারে মর্মমূলে পৌঁছে গিয়ে বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাকে গৌণ জ্ঞান করেছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ 'বিভিন্ন মতাদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করে, তাদের মধ্যে সকল অন্তর্দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে একটা সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন।' ডঃ সালাহ্উদ্দীন আহমদ ১৯৮৬ সালের 'অমর একুশে বক্তৃতা'-য় এই কথা বলেছেন। আর রাজা রামমোহন রায়? রামমোহন বিশ্বাস করতেন, 'কারোই তার নিজস্ব ধর্ম পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই; প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে বিশ্বজনীন ও চিরন্তন সত্য নিহিত আছে সেই উপলব্ধি করতে হবে সকল রকম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বর্জন করে।'

তবু আমরা তিতুমীরের আন্দোলনের কথা স্মরণ করব। জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের নানাবিধ শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন। ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে কৃষক ও অন্যান্য মজলুম ছিলেন শোষিত। কিন্তু জমিদার ও মহাজনরা অধিকাংশ হিন্দু বলে আন্দোলনটি পরে উচ্চকণ্ঠ ও উগ্রকণ্ঠ বোল তুলতে থাকে। কিন্তু কেন? এই 'অধিকাংশ' সমগ্র জনসংখ্যার কত অংশ? অত্যাচারীরা হিন্দু বলেই কি নির্যাতিত ও শোষিত হিন্দু কৃষকের কাছে সেই অত্যাচারকে হোলির উৎসব মনে হয়েছিল?

বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে। ফরিদপুরের হাজি শরিয়তউল্লাহ যে আন্দোলনটি শুরু করেন তা গোড়ায় ইসলামি মৌলবাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে তা কৃষক আন্দোলন হয়ে বেগ, তেজ, আর জোর পায়। বিশেষ করে তাঁর পুত্র দুদু মিঞার নেতৃত্বে।

দেখা গেছে, নেতারা যেমন অনেক সময় দলীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও স্বার্থে জনমত গঠন করেন, তেমনি জনমতও তার নেতা তৈরি করে নেয়। কিন্তু প্রায়ই নেতারা আমাদের যে পাত্রে ঢালেন, আমরা সেই আকার-ই গ্রহণ করি। সে কারণেই মাঝে মাঝেই সত্য সমাধিস্থ হয় ও মিথ্যা চাকচিক্য লাভ করে।

দুই

এই উপমহাদেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ঐকতানের ঐক্য গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু পারেনি। যে বস্তুটি মাঝখানে আড়াল তৈরি করল, সেটি স্বার্থ। এবং স্বার্থ কেবল ধর্মকে কেন্দ্র করেই জমা হয়ে ওঠে না। অনেক সময় গুটিকয়েক নেতার স্বার্থান্ধ ধূম্রজাল সুস্থবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। যেহেতু সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ছিল পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ আর বোম্বাই-গুজরাটের হাতে, সেইহেতু তাঁরা যে সুরে বাঁশি বাজিয়েছেন, আমরা সেই সুরে নেচেছি। মাঝে মাঝে আমরা তাঁদের ছাঁচে গড়া পাত্র উপচে বেরিয়ে

আসতে চেয়েছি, কিন্তু আমাদেরই নেতারা 'তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি'-এর মতো অনুগত অনুগ্রহপ্রার্থীর ভূমিকা নিয়েছেন।

অবশ্য, ধর্ম-কে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদ তৈরি করবার প্রেরণা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও দেখেছি। তিনি নিঃসন্দেহে এক হিন্দুরাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন—সেই স্বপ্নটা তৈরি হয়েছিল—বিজেতা-বিজিত সম্পর্কের বিষভাণ্ডে। তাঁর সেই হিন্দুরাজে মুসলমানের দশাটা কেমন হবে তার কিছু নমুনা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে আমরা দেখেছি। সেখানে প্রধান পাত্রদের উক্তি এই রকম... 'কাপ্তেন শাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদের শত্রু নহে।... ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।' জ্ঞানানন্দ আগেই বলেছেন, 'এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব।' উপন্যাস শেষ হচ্ছে এই কথায়—'শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজ্য।' 'আনন্দমঠ' লেখা হয় ১৮৮২ সালে।

১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগ-এ মুসলিম লিগ গঠিত হয়। অন্যান্য কিছু প্রস্তাবের মধ্যে এই ঘোষণাও ছিল : I do not hesitate in declaring that unless the leaders of the Congress make sincere efforts as speedily as possible to quell the hostility against the Government and the British race... the necessary consequence of all that is being openly done and said to-day will be that sedition would be rampant and the Mussalmans of India would be called upon to perform the necessary duty of combating this rebellious spirit, side by side with the British Government, more effectively than the use of words।

মুসলমান নবাব ও নাইটরা বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর কথাই ফিরিয়ে দিলেন। 'শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজ্য।'

তবু বিপরীত মানসিকতাও আমরা দেখেছি। যে সময়টায় ঢাকায় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, প্রায় সেই মুহূর্তেই জিন্নাহ শাহেব তাঁরই মতো ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী আরো ৪২ জন মুসলমান নেতার সঙ্গে কলকাতায় কংগ্রেসি রাজনীতিতে অবতীর্ণ। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের সেই বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজির সচিব হিশাবে জিন্নাহ শাহেব কাজ করছেন। অসুস্থ নওরোজির যে ভাষণটি গোখলে পাঠ করলেন, সেটির মুসাবিদা জিন্নাহ শাহেবেরই হাতের কাজ বলে কথিত। আরো আছে। ১৯১০ সালে এলাহাবাদ কংগ্রেসে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থায় separate electorate-এর বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব পাস হয়, স্বয়ং জিন্নাহ শাহেব তা সেকেন্ড করেন। যদিও মজার কথা হচ্ছে এই যে, তার আগেই ১৯০৯ সালে জিন্নাহ শাহেব স্বতন্ত্র নির্বাচনের বলেই বোম্বে থেকে মুসলমান প্রার্থী হিশাবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

Scanned with CamScanner

১৯৩৭ সাল অবশ্য ইতিহাসের আর একটি নাট্যাঙ্ক। জিন্নাহ শাহেব তখন মুসলিম লিগ-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। বেঙ্গলের ফজলুল হক শাহেব ও পাঞ্জাবের স্যার সিকান্দর হায়াত খান তখনো মুসলিম লিগের ঝান্ডা স্পর্শ করেননি। এই অবস্থায় নির্বাচন হল। দেখা গেল বেঙ্গলে ১১৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লিগ মাত্র ৩৯টি লাভ করেছে। পাঞ্জাবে ৮৪টির মধ্যে মাত্র একটি; সীমান্ত প্রদেশে ৩৬টির মধ্যে একটিও নয়; সিন্ধু প্রদেশে ৩৩টির মধ্যে তিনটি; আসামে ৩৪টির মধ্যে ৯টি; বিহারে ৩৯টির মধ্যে শূন্য। যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু এবং যাঁদের পক্ষে তাঁদের ভিটে-মাটি ঘটিবাটি নিয়ে পাকিস্তানে উঠে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তাঁরাই বরং মুসলিম লিগকে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যায় ভোট দিলেন। যখন পাকিস্তান কায়েম হল, তখন ভোটদাতাদের হিংস্রতার মুখে ফেলে রেখে তাঁদের নেতারা পাকিস্তানের উজির-নাজির হলেন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগ তিনটি প্রধান খুঁটিকে আশ্রয় করেছিল: (১) মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান; (২) উর্দু ভাষা ও বর্ণমালার স্বার্থ সংরক্ষণ; (৩) মুসলমানদের অবস্থার উন্নতির জন্য উপায় উদ্ভাবন।

ফলাফল কী হয়েছিল আমরা দেখেছি।

বেঙ্গল ও পাঞ্জাবে জিন্নাহ শাহেবের পায়ের নীচে শক্ত মাটি ছিল না।

যুক্তপ্রদেশের চৌধুরী খালিকুজ্জামানের মধ্যস্থতায় ফজলুল হক শাহেব ও স্যার সিকান্দার হায়াত মুসলিম লিগের সহযোগিতায় বেঙ্গল ও পাঞ্জাবে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। কিন্তু হক শাহেব ও স্যার সিকান্দার পাকা রাজনীতিবিদ। নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর খুবই সচেতন ছিলেন। শেরে বাংলা ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লিগের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার আদায় করে নিলেন...that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North-Western and Eastern zones of India, shall be grouped to constitute Independent States in which the constitutent units shall be autonomous and sovereign।

কিন্তু জিন্নাহ শাহেবের সঙ্গে হক শাহেবের মুখোমুখি সংঘর্ষ দেখলাম হক শাহেবের ইন্ডিয়ান ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগদানকে কেন্দ্র করে। ভাইসরয় বেঙ্গলের প্রিমিয়ার হিশাবে হক শাহেবকে এই কাউন্সিল-এ যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তার আগে জিন্নাহ শাহেবের এজাজত নেননি। জিন্নাহ শাহেব ফরমান জারি করলেন : ফওরন ইস্তফা দাও। হক শাহেব ডিফেন্স কাউন্সিল ও মুসলিম লিগ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তার আগে তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা শোনা গেল...The

principles of demorarcy and autonomy in the All India Muslim League are being subordinated to the arbitrary wishes of a single individual who seeks to rule as an omnipotent authority even over the destiny of 33 millions of Muslims in the province of Bengal who occupy the key-position in Indian Muslim Politics।

একুশের আন্দোলন অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে। এই আন্দোলন ধীর, অলক্ষ্য, কিন্তু অনতিক্রম্য ও অব্যর্থ।

হক শাহেবের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাঁকে বিদায় নিতে হল। এবার মঞ্চে উপস্থিত হলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। কিন্তু জিন্নাহ শাহেব দেখলেন, তবু স্বস্তি নেই। ১৯৪৪ সাল। আর. জি. কেসি বেঙ্গলের গভর্ণর। নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি ভাইসরয়কে লিখলেন : নাজিমুদ্দীন যে ইস্টার্ন পাকিস্তানের কথা চিন্তা করছেন, তা হচ্ছে ... The picture of a wholly autonomous sovereign Stae ... in which Muslims and Hindus would live in amity and share the responsibility for the business of Government (and all else) in approximate proportion to their numbers. (Transfer of Power—Vol. V—p 345)।

জিন্নাহ শাহেবকে তখনও খামোশ থাকতে হচ্ছে। তাঁর পক্ষে জনমত কতটা তৈরি হয়েছে তিনি জানেন না। একবার হয়ে গেলে, প্লাবনের মতো তাঁর বিরুদ্ধ-শক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এল ১৯৪৬ সালের নির্বাচন। বেঙ্গলে মুসলিম লিগ ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৩টিতেই জয়লাভ করল; পাঞ্জাবে ৮৮টি আসনের মধ্যে ৭৫টি; সিন্ধুতে ৩৪টির মধ্যে ২৮টি; আসামে ৩৪টির মধ্যে ৩১টি; কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে ৩৮টির মধ্যে ১৭টি।

এই ফলাফল কেউ রদ করতে পারবে না। তাই 'ইস্টার্ন জোন'কে লাহোর প্রস্তাবে যে স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, জিন্নাহ শাহেব সেটাকেই রদ করে দিলেন। ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল মুসলিম লিগ-এর কনভেনশন প্রস্তাব পাস হল : That the zones comprising Bengal and Assam in the North-East, and the Punjab, North-West Frontier province, Sind and Beluchistan in the North-West of India, namely Pakistan zones, where the Muslims are in a dominant majority, be constituted into a Sovereign Independent State...।

জিন্নাহ শাহেব এমন সুকৌশলে কাজটি করলেন যে বাঙালি মুসলমানরা জানতেও পারলেন না যে তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এ-কথাও কেউ জানতে পারলেন না যে একুশে ফেব্রুয়ারি ও একাত্তরের আন্দোলনের

Scanned with CamScanner

বারুদ জমা হচ্ছে।

তিন

তবু এ-কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় বা কারণ নেই যে অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লিগ রাজনীতি প্রসারের ও প্রভাবের যথেষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। পেটে মারলে শরীর কষ্ট পায়, কিন্তু মর্মে আঘাত করলে হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়। বাংলার প্রতিবেশী হিন্দুদের কাছ থেকে মুসলমানরা এই আঘাতটাও পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোষে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে একধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু-প্রজারা।' রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন : 'এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে ততদিন স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় একপক্ষের কল্যাণভার অপরপক্ষের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে।'

রবীন্দ্রনাথ কথাগুলি বলেছিলেন ১৩৩৮ সালে। তবু রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছে, 'যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?'

লালন ফকিরও গান গেয়েছেন : 'সবাই বলে লালন ফকির, হিন্দু না যবন/লালন বলে আমার আমি/না জানি সন্ধান।/এক ঘাটেতে আসা যাওয়া/এক পাঁটেতে দিচ্ছে খেয়া, ওরে ভাই—/তবে কেউ খায় না কারো ছোঁয়া/ভিন্ন জল কোথায় পাই।'

নজরুল ইসলাম উদার-উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন : 'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ/কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!/"হিন্দু না ওরা মুসলিম" ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?/কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা-র!'

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আরো এক ধাপ এগিয়ে বললেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমার বাঙালি।'

আর চণ্ডীদাস তো বলেইছেন : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

কিন্তু এসব ভালো-ভালো কথায় কোনো কাজই হয়নি। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান তাদের নিজ-নিজ ধর্মরক্ষা করেও সৌহার্দ্য রক্ষা করে আসছিল। কিন্তু তারা যতই শিক্ষিত হতে লাগল, ততই অসহিষ্ণু। সে কীরকম শিক্ষা?

যাই হোক, ভারত-বিভাগের যে যুক্তি মুসলিম লিগ ব্যবহার করলেন, তারই পুনরুক্তি করে মাউন্টব্যাটেন জব্দ করলেন মুসলিম লিগকে। পাঞ্জাব ও বাংলার বিভাগ

অনিবার্য হয়ে গেল। জিন্নাহ শাহেব অনেক চিল্লাচিল্লি করলেন। কিন্তু ইংরাজরা ওসব কথা অনেক শুনেছে। তারা কর্ণপাতও করল না। এমনকী, কলকাতাকে পাকিস্তান থেকে বাদ দিল।

জিন্নাহ শাহেব ঘোষণা করলেন, ওরকম moth-eaten truncated Pakistan তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ইংরাজরা তাদের কাছে যেটা গ্রহণযোগ্য সেটাই করে, অন্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তাদের অত মাথাব্যথা নেই। তাছাড়া, তারা লোক চেনে। তারা জানে, এই ব্যবস্থাও জিন্নাহ শাহেবের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। বেঙ্গল ও বাঙালি মুসলমানের জন্য জিন্নাহ শাহেব যতই অশ্রুপাত করুন, তাঁর আসল পেয়ার পশ্চিম ভূখণ্ডের জন্য।

শহীদ শায়েব বিপাকে পড়লেন। তাঁকে সুর বদলাতে হল। তাঁকে এবার বলতে হল... We Bengalis have a common mother tongue and common economic interests. Bengal has very little affinity with the Punjab. Bengal will be an independent State and decide by herself later whether she would link up with Pakistan।

শহীদ শাহেবের কথাটি জিন্নাহ ও মাউন্টব্যাটেনের কর্ণগোচর হল। মাউন্টব্যাটেন জানতে চাইলেন, এ ব্যাপারে জিন্নাহ শাহেবের মতটি কী? জিন্নাহ শাহেব বললেন... I should be delighted. What is the use of Bengal without Calcutta? They had much better remain united and independent. I am sure they would be on friendly terms with us। জিন্নাহ শাহেবের এই উক্তি পরবর্তীকালে লিগ-নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করেছেন। স্বয়ং জিন্নাহ শাহেব থেকেছেন নীরব। কিন্তু এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। আজ তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ (Transfer of Power—Vol. X—p. 452-453)।

কিন্তু শহীদ শাহেব চাইলেই তো হবে না। দেখা গেল, হিন্দু-প্রধান অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের অবস্থানকে কংগ্রেসের চোখে একটা খুব ভালো জিনিশ মনে হলেও মুসলমান-প্রধান অখণ্ড বাংলাদেশ তাঁরা বরদাস্ত করতে রাজি নন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি-র অধিবেশনে বেঙ্গলের হিন্দুপ্রধান অংশ ঠিক করলেন, তাঁর আলাদা হয়ে যাবেন এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্গত থাকবেন। আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ধাপে ধাপে নিজের জায়গায় অগ্রসর হতে শুরু করেছে। একদিক দিয়ে পশ্চিমপাকিস্তানের মুসলমানরা এবং অন্যদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা, সেই জায়গায় আমাদের পৌঁছে দিচ্ছেন। অবশ্য, অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়া কাটলেন :

'ভুল হয়ে গেছে/বিলকুল/আর সব কিছু/ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো/নজরুল।/এই ভুলটুকু/বেঁচে থাক/বাঙালি-বলতে/একজন আছে/দুর্গতি তার/ঘুচে

Scanned with CamScanner

যাক।'

চার

খ্রিষ্টপূর্ব ২৩০০ সালের মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার উত্তরাধিকার নিয়ে পশ্চিমে পশ্চিমপাকিস্তান ও পূর্বে পূর্বপাকিস্তান একটি অখণ্ড রাষ্ট্রীয় সত্তা হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিল। বর্তমান পাকিস্তানে এখনো মোহেঞ্জোদারোর ভগ্নাবশেষের সামনে এক নির্দেশিকায় লেখা আছে : 'পাকিস্তানি ঐতিহ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন'।

আর্নল্ড টয়নবি লিখেছেন : The Aryans, who passed through at some date during the second half of the second millenium BC, brought the Sanskrit Language to India. They were the fathers of the Hindu Civilization that supplanted the pre-Aryan culture which is represented in the Indus Valley by the sites at Mohenjodaros and Harappa।

অপরপক্ষে, উর্দু ভাষা, লখনৌ ও দিল্লির ইরান-মোগল সভ্যতা, মোগল ও মুসলমানদের তাহজিব, তারিকা ও স্থাপত্য ও সংগীত প্রধানত উত্তর ভারতেই ফেলে রেখে আসতে হল।

যাই হোক, আমরা আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে এসে এইবার এই আলোচনা শেষ করি। আমরা দেখলাম, শুধু ধর্মের মিলটুকুই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে মেলাতে পারছে না। উর্দু হচ্ছে দিল্লি ও লখনৌ-এর ভাষা—পাকিস্তানের নয়। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের তো নয়-ই। তবু আমাদের শুনতে হল : ...Urdu and only Urdu shall be the State language of Pakistan। তারও আগে Interim Government যখন গঠিত হল, মুসলিম লিগের মন্ত্রী হলেন লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার, আই. আই. চুন্দ্রীগড়, রাজা গজনফর আলী খান। বাঙালি প্রতিনিধি কে হলেন? হক সাহেব নন, নাজিমুদ্দীন সাহেব নন, সুহরাওয়ার্দী সাহেব নন। হলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি কে? দাবার খেলা ও দেশপ্রেম এক জিনিশ নয়। জিন্নাহ সাহেব দাবার খেলা খেললেন। আসলে, সেই তখন থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। পূর্বপাকিস্তানের উপনির্বাচনে টাঙ্গাইলের মুসলিম লিগ প্রার্থী হেরেই গেলেন। অন্যান্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পূর্ববাংলার প্রকৃত প্রতিনিধিরা জয়ী হবেন—তাই আর কোনো উপনির্বাচন দেওয়াই হল না। '৫৪ সালে যখন পূর্বপাকিস্তানে নির্বাচন দিতে হল, তখন বাংলাদেশ থেকে মুসলিম লিগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিনিধিদের মন্ত্রীসভা গঠন করতে দিতে হল। কিন্তু অল্পদিনেই আমার জেনে ফেললাম, সেটা একটা লোক-দেখানো ব্যাপার। লাগানো হল আদমজি পাটকলের দাঙ্গা। এল ৯২-ক। এলেন ইস্কান্দর মীর্জা। এলেন আইয়ুব খান। শুরু হল ৬৯-এর আন্দোলন। নির্বাচন এল ৭০ সালে। কেন্দ্রে বৃহত্তম

দলকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে দেওয়া হল না। পরিষদের অধিবেশন পর্যন্ত বসল না। '৭১ সালে শুরু হল ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা। মুসলমানরাই বাঙালি মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হল। আমরা আমাদের জায়গায় পৌঁছে গেলাম।

Scanned with CamScanner